সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ

সুধীর চক্রবর্তী

অর্ধশতাধিক বই লিখেছেন যিনি, আশ্চর্য যে তাঁর লেখা সাহিত্য বিষয়ক বই মাত্র ২টি। *কবিতার খোঁজে* এবং *কবিতার বিচিত্র পথে*। বাংলা উপন্যাস আর ছোট গল্পের সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকসম্পাতকারী ৬টি চমকপ্রদ রচনা নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর সদ্যতন বই *সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ*। লেখাগুলির বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ যেমন অভিনব, তাত্ত্বিক ভাষ্যটুকু তেমনই মৌলিক। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, কালকূট ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং কয়েকজন আধুনিক গল্পকারের লেখার মধ্যে কীভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে লোকায়তের অমোঘ স্পর্শ তা চিহ্নিত করাই এ বইয়ের লক্ষ্য।

সুধীর চক্রবর্তী : জন্ম ১৯৩৪ শিবপুর, হাওড়া। শিক্ষা কৃষ্ণনগর ও কলকাতায়। এখন দুই শহরের উভচর। ১৯৫৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। মৌলিক ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা ৬০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও এমিনেন্ট টিচার খেতাব। সাহিত্য অকাদেমি সম্মান, আনন্দ পুরস্কার, নরসিংহ দাস পুরস্কার সহ অন্যূন আরও ৫টি পুরস্কারের প্রাপক। তাঁর পছন্দের বিষয় গান ও গ্রাম। মননশীল গবেষণা ও স্বতন্ত্ররীতির গদ্যরচনার পাশাপাশি লিখতে ভালোবাসেন নানা রকমের আখ্যান। এখন ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর অনারারি প্রোফেসর।

সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ

সুধীর চক্রবর্তী

GRONTHO.COM

দেশ

SAHITYER LOKAYATA PATH
by Sudhir Chakarvarti

Published by
PATRALEKHA
10B College Row
Kolkata - 700 009
Published in
January 2013

Rs. 150.00

স্বত্ব : শ্রেয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০১৩
গুণেন শীল
পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো
কলকাতা ৯
ফোন ৯৮৩১১১০৯৬৩

প্রচ্ছদ ছবি
অচিন্ত্য সুরাল

বর্ণসংস্থাপক
অ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন
মুদ্রক
স্বপ্না গ্রাফিকস্
কলকাতা - ৬

দাম
১৫০.০০

উৎসর্গ

বই পাগল

শ্রী অরুণ দে-কে

আত্মপক্ষ

আমার ছাত্রজীবন গড়ে উঠেছে সাহিত্যপাঠে। অধ্যাপনা জীবনের সবটাই কেটে গেছে সাহিত্যের পাঠদানের কাজে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ আমার লেখক জীবনের অভিজ্ঞতা কেন যেন বৈচিত্র্যসঞ্চারী কৌতূহলে ছুঁতে চেয়েছে সমাজ ও সংস্কৃতির নানা প্রান্তর। লোকধর্ম , সংগীত, শিল্প, শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজনৃতত্ত্ব আর নবরূপের আখ্যান রচনায় কেটে গেছে দীর্ঘজীবন। অথচ কি আশ্চর্য যে ঘটনাচক্রে সাহিত্য বিষয়েই আমি লিখেছি সবচেয়ে কম। কেবল বাংলা কবিতা বিষয়ে দুটি বই এ পর্যন্ত লিখেছি। অবশেষে, এতদিনে, প্রকাশ পাচ্ছে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প বিষয়ে ছটি রচনা নিয়ে একটা সংহত আকারের বই। এর অন্তর্গত রচনাকটি গত দু'দশকের নানা সময়ে পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে এবং তার মূল অনুসন্ধান একদিকেই ধাবিত : বাংলা কথাসাহিত্যের মধ্যে লোকায়তের চিহ্ন খোঁজা। বিষয়গত তাৎপর্যের বিচারে ব্যাপারটি নতুন।

সাহিত্যবিচারে গত কয়েকদশকে ঝোঁক পড়েছে তুলনামূলকতা আর বিনির্মাণ তত্ত্ব নিয়ে। এ বইতে পাঠকরা তার খানিকটা পরিচয় পাবার আশা করতে পারেন। এর বেশি কিছু বলা হতে পারে প্রগল্‌ভতা। বইটি আগ্রহ আর যত্ন নিয়ে প্রকাশ করলেন আমার স্নেহভাজন প্রকাশক শ্রী গুণেন শীল। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নয়।

৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন
কৃষ্ণনগর ৭৪১১০১
দূরভাষ : ৯৪৭৫১১০৬০২

সুধীর চক্রবর্তী

সূচি

আরণ্যক : লোকায়ত পাঠ ১১
কবি উপন্যাসের লোকায়ত পাঠ ৩৪
কালকূট : লোকে লোকায়তে ৬৬
অলীক মানুষ : লোকায়তের মিথ ৯৭
বিভূতিভূষণ : ছোট গল্পের লোকায়ত অনুবিশ্ব ১১৯
বাংলা গল্পে লোকায়ত অনুসন্ধান ১৪১

GRONTHO.COM

আরণ্যক : লোকায়ত-পাঠ

'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন, শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি।'

স্মৃতির রেখা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

উনিশ শ আটাশ সালে নির্জন ডায়েরির এই অঙ্গীকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূরণ করেন আরও প্রায় এক দশক পরে, ১৯৩৭ সালে, *প্রবাসী*-তে বেরোতে থাকে ধারাবাহিক রচনা *আরণ্যক*। জঙ্গলবাসের স্মৃতির রেখা তখন কি মুছে গেছে, নাকি তখনও জীবন্ত? সে প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে যায় যখন দেখি আরণ্যকের বিস্ময়কর বর্ণনাবহুল বর্ণময় ডকুমেনটেশন। কেবল সজীব গতিশীল প্রকৃতির নয়, ব্রাত্য মানুষেরও। কেমন করে পারলেন এমনভাবে স্মৃতিকে তরতাজা রাখতে, সে-প্রশ্ন আনত হয় শতবর্ষের উত্তীর্ণ বিগ্রহ বিভূতিভূষণের সৃজনপ্রতিভার স্মরণে। নাকি নিসর্গ ও মানুষকে নিয়ে কৌতূহল তাঁর আশৈশবের লালিত এক অন্তঃশীল ধারাবাহিকতা, যাতে একটা ব্যাপক ও গভীর মাত্রা আনে পূর্ণিয়ার জঙ্গলমহলের যাপনগত প্রত্যক্ষতা? এক দশক পরে লিখতে বসেও তাই টলে না স্মৃতির রেখা, ধূসর হয় না পরিপার্শ্বের টান।

এবারে মূল কথাটা বোঝাতে, কয়েকটা জীবনতথ্য উঠে আসবে। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করতে করতে ওই খেলাত ঘোষেদেরই বিস্তৃত জঙ্গলমহল এস্টেটে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে বিভূতিভূষণ গিয়েছিলেন ভাগলপুরে ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে। তখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় অপরিচিত। পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে মাত্র গোটাচারেক গল্প। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ তাঁর জঙ্গলবাসের পর্ব। ১৯২৮ সালে নিবিড় অরণ্যানীতে বসেই তাঁর *পথের*

পাঁচালী রচনা শুরু হয়। *আরণ্যক* লেখার সঙ্কল্প ওই ১৯২৮ সালেই। কিন্তু ১৯২৯ সালে অরণ্যের প্রত্যক্ষতা থেকে তিনি চলে এসেছেন কলকাতায়, চাকরি করতে শুরু করেছেন খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশনে, শিক্ষকতার। আরও আট বছর পরে কলকাতায় বসে শুরু করবেন *আরণ্যক*, বেরোবে দু বছর ধরে '*প্রবাসী*'-তে। ততদিনে বিভূতিভূষণ *পথের পাঁচালী*-র বিখ্যাত লেখক। কিন্তু এ কথা ভাবতে অবাক লাগে যে, নিবিড় জঙ্গলের মায়াময় নিঃসঙ্গতায় বসে তিনি লিখেছিলেন নিশ্চিন্দিপুরের পাঁচালি, আর কলকাতার কলকোলাহলময় ঘনবসতির মধ্যে বসে লিখেছিলেন অরণ্যজীবনের শান্ত ঔদাসীন্য। বীজ নিষেকের কাল থেকে চারা গজানো পর্যন্ত একটা সময় ও জলমাটির শুশ্রূষা লাগে। তাঁর সৃজনস্বভাবে কোনও ত্বরা ছিল না।

স্মৃতিসঞ্চয়ী অন্তর স্বভাবের এই মানুষটির রচনা *আরণ্যক* পড়লে বোঝা কঠিন, তার কতটা উপাদান স্মৃতিজারিত অভিজ্ঞতা আর কতটা কল্পনা। কিন্তু সে সংশয় ছাপিয়ে আধুনিক পাঠকের কাছে যেটা প্রাসঙ্গিক মনে হয় সেটা এর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন। লিখনশৈলির সংবেদন এবং বিষয়বর্ণনার প্রত্যক্ষতা *আরণ্যক*-এ এত অপরূপ ও অমোঘ যে পাঠক কখনই প্রশ্ন তোলেন না, এমন জায়গা কি আছে আর এমনতর সব মানুষজন! হিসেব করে দেখছি, *আরণ্যক* আমি উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে পড়েছি, পাঠক্রমের বাধ্যতায়, প্রশ্নোত্তরের কালিমা মিশিয়ে, কলেজে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষের অধ্যাপকীয় ব্যবচ্ছেদের বাইরেও তো একটা স্বচ্ছ জগৎ ছিল আমার, সেই জগতে *আরণ্যক* একটা পাকা জায়গা করে নিয়েছিল। সেই বয়সে অন্তত পনেরো-কুড়িবার যে *আরণ্যক* পড়ে ফেলেছিলাম সে নিশ্চয়ই লেখার গুণে আর বিন্যাসের টানে। তারপর কত বছর কেটে গেল। কত রকমের দেশি-বিদেশি কথাসাহিত্য পড়লাম। বিভূতিভূষণ আমাদের কৈশোর যৌবনেই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত কথাকার। তাঁর রচনার আরেকটি সমান্তরাল পাঠ, চলচ্চিত্র-পাঠ, আমাদেরই জীবনে ফুটে উঠল সত্যজিৎ রায়ের সৃজনে মননে। আজ আরও কত রকমের আলো এসে পড়েছে এই মহান কথাকারের জীবন ও সাহিত্যে। সেই

স্বতন্ত্র উদ্‌ভাসন ও বীক্ষণ থেকে আর একবার *আরণ্যক* পড়তে গিয়ে মনে হল, *আরণ্যক*-এর আরেকটা পাঠ জরুরি, তার লোকায়ত-পাঠ। কথাটা বোঝা দরকার।

১৯২৪ থেকে ২৮ সাল পর্যন্ত বিহারের পূর্ণিয়া-ভাগলপুরের গহন জঙ্গলমহালে যে-জীবন বিভূতিভূষণ দেখেছিলেন, তাঁর ভাষায় 'গতিশীল' ও 'ব্রাত্য', তাতে নিম্নবর্গের সম্পর্কে এক অনুকম্পায়ী ভালবাসা আছে। দেহাতি মানুষ মুনেশ্বর সম্পর্কে সত্যচরণের উপলব্ধি : 'আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো। বড় কষ্ট তো এদের!' প্রথম পরিচ্ছেদের শেষের এই ধরতাই থেকে বোঝা যায় লেখকের ঝোঁক কোনদিকে। তারপরে বহুদিন ভাত-খেতে-না-পাওয়া রবাহূত মানুষজন যখন আট-দশ মাইল হেঁটে সত্যচরণের কাছারিতে ভাত খেতে আসে, তাদের দিকে চেয়ে (লেখক) অর্থাৎ সত্যচরণ লক্ষ্য করেন :

> 'যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়' এবং। কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবনসংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে।

এ সব মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় একজন অন্যবর্গের লেখক এসেছেন বাংলা সাহিত্যে।

নিম্নবর্গের জীবন সম্পর্কে উৎসাহী বিভূতিভূষণ নিরহঙ্কার ও নিরলঙ্কার মানুষ আর নিসর্গ সম্পর্কে সমান আগ্রহী। তাই তাঁর সত্যচরণ জঙ্গলমহালের পূর্ব দক্ষিণ সীমানা থেকে সাত-আট ক্রোশ দূরে অর্থাৎ সদর কাছারি থেকে চোদ্দ-পনেরো ক্রোশ দূরে এক গ্রাম্য মেলায় যান, কারণ 'এ দেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল'। গড়পড়তা শহুরে কৌতূহল একে বলা যাবে না, কারণ অনিশ্চিত প্রাকৃত অরণ্যপথে ত্রিশ মাইল ব্যবধান ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া তাঁর মনের অন্য

একটা টানকে শনাক্ত করে। এ টান লোক-লৌকিকের। সে মেলায় গিয়ে যে গভীরতর লাভ হল সেটা বোঝা যায় দুটি বর্ণনায়। প্রথম বর্ণনা একজন মানুষের। মেলার এক পাশে যেখানে ইজারাদারের তাঁবু সেখানে পুরনো বেন্টউড চেয়ারে সত্যচরণকে খাতির করে বসাল ব্রহ্ম মাহাতো। কিন্তু সেখানে বসে সত্যচরণ কী দেখেন? 'সেখানে একজন লোক দেখিলাম, অমন লোক বোধহয় পৃথিবীতে আর দেখিব না।'

কী দেখেছিলেন সেই 'বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর, গা খালি, রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো' মানুষটির মধ্যে? সত্যচরণের উপলব্ধি:

> মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন নম্র-ভাব দেখিয়া। ...লোকটা আমার দিকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ও দীনতার দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এক-আধ বারের বেশি চাহিতে ভরসা পাইল না। ভাবিলাম লোকটার অত দীনহীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরীব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বার বার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, Blessed are the meek for theirs is the kingdom of heaven, এমনধারা সত্যিকার দীন-বিনম্র মুখ কখনও দেখি নাই।

একেই হয়ত বলে সৎ মানুষের স্বচ্ছ চোখে অনাবিল লৌকিক জগতের উদ্‌ভাসন, যা ব্রাত্য ও নিরুপকরণ। এই চোখেই মূল্য পেয়ে যায় অজানা কুসুম, অশনাক্ত বনজ লতা এবং অনাদৃত গুল্ম। একজন অপরিচিত ব্রাত্য মানুষের দীনার্ত দৃষ্টি লেখককে কেন টানে তার জবাব এলিটিস্টদের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। *আরণ্যক* সম্পর্কিত আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনের বহুতর নিবন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু মেলার বহু মানুষের সমাগমে ওই 'দীন—বিনম্র মুখ'-টি সম্পর্কে লেখকের আলাদা উল্লেখ ও অনুকম্পায়ী মন বিষয়ে কেউ লেখেননি। লেখেননি তার কারণ বিভূতি-সাহিত্যের যথার্থ লোকায়ত-পাঠ আজও অপেক্ষিত রয়ে গেছে। কিন্তু সতর্ক পাঠে বারেবারে ব্রাত্য মানুষের অস্তিত্ব ও আনন্দ গ্রহণের ক্ষমতা বিষয়ে বিভূতিভূষণের সজাগ চোখ নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে।

গ্রামে গম-কাটানোর সময় যে মেলা হয় তাতে এক আনা দামের বাজে একখানা সাবান যখন পাঁচ সের সর্ষের বিনিময়ে 'সরলা বন্য মেয়েরা' কেনে এবং ঠকে, তখন লেখক ব্যথিত হন কিন্তু তাদের সম্পর্কে এক ধরনের আদ্রতা জাগে। মঞ্চী সতেরো সের সর্ষের বদলে একছড়া সামান্য হিংলাজের মালা কেনে এবং তার 'গর্বমিশ্রিত আনন্দের ও আগ্রহের' আননখানি লেখক দেখতে ভুল করেন না। বিশ্লেষণ করে লেখেন:

> সত্যি, কি খুশী ও গর্বের হাসি দেখিলাম ওর মুখে! ওর সভ্য বোনেদের মত ও মনের ভাব গোপন করিতে তো শেখে নাই, একটি অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা ওর এইসব সামান্য জিনিসের অধিকারের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নারী-মনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিবার সুযোগ আমাদের সভ্য-সমাজে বড় একটা ঘটে না।

লেখক তাই মঞ্চী-নকৃছেদীকে বলেন না যে গ্রাম্য ব্যাপারীর কাছে তারা কতটা ঠকেছে, কারণ 'ওর মনের এই অপূর্ব আহ্লাদ' নষ্ট করতে চান না তিনি। এই হল লোকজীবনের প্রতি যথার্থ দরদের নমুনা। এই সূত্রে শিল্পী ও অন্তর্দ্রষ্টা বিভূতিভূষণের স্বরূপ ফুটে ওঠে যখন এক বছরের ব্যবধানে মঞ্চী আর আসে না কাটুনিদের সঙ্গে, আসে তার স্বামী, সতীন ও সতীন কন্যারা। মঞ্চী নাকি কোথায় পালিয়ে গেছে। লেখকের কৌতূহল জাগে—'মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?' দেখা গেল, মঞ্চীর ফেলে-রেখে-যাওয়া ছোট বাক্সে চিরুনি, ছোট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ-রঙের খেলো রুমাল সবই আছে। 'সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই।' এক আঁচড়ে গ্রাম্য বালিকাবধূর অন্তর্গোপন রহস্যময় মনোজগৎ উন্মুক্ত হয়।

হোলির মেলায় অন্য এক বর্ণনা লেখকের পর্যুৎসুক কৌতূহলের অমোঘ প্রমাণ ধরে রেখেছে। মেলার নানা প্রান্তে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে:

> হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্ত কান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ী ডাঙায় যুবক-যুবতীরা ভিড় করিয়া

দাঁড়াইয়া হাসি-খুশী গল্প-গুজব আদর আপ্যায়নে মত্ত ছিল—কান্নাটা উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল? একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তা নয়, কোনও একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনও মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—এ দেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মরাকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ির মানুষ দেখিয়া কাঁদে নাই—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামিগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।

জঙ্গলবাসের প্রায় এক দশক পরে *আরণ্যক* কাহিনি লিখতে গিয়ে বিভূতিভূষণের এই যে বিশেষ এক মেয়েলি রিচ্যুয়াল মনে পড়া, এ তাঁর লোকায়ত জীবন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও মমতার পরিচয় বহন করে। পরিবেশ পরিস্থিতির নিখুঁত অনুধাবন এবং তার সরাসরি ডকুমেনটেশন *আরণ্যক*-এ বহুবার আসে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। *আরণ্যক* কোনও স্থায়ী জনপদ বা সমাজবদ্ধ স্থির ব্যবস্থার মানুষকে আঁকেনি। যদিও ব্রাহ্মণ-গাঙ্গোতা-দোষাদ-সাঁওতাল ও রাজগোঁড় এইসব নানা থাকের মানুষ ও তাদের বর্ণস্বভাব অরণ্যপরিবেশেও অটুটু থাকে, অন্তঃশীল হয়ে থাকে বিহার অঞ্চলের সংস্কারময় আচরণবিধি তবু *আরণ্যক*-এ একটা ভ্রমণশীল লোকসংস্কৃতি বিশেষ পাঠে চোখে পড়ে। লোক-লোকায়তের স্থায়ী জনপদে বারব্রত, পার্বণ ও উৎসবে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয় নাচ-গান, মেয়েলি ছড়া ও ধাঁধা, *আরণ্যক*-এ তার অবকাশ নেই। কিন্তু মানুষের বয়ে-আনা সংস্কৃতি, যাকে বলে parambulating culture, তার নানা চিত্তাকর্ষক নমুনা আছে, ছাত্রজীবনের পাঠে যার তাৎপর্য পাইনি, এবারে নতুন পাঠে তা স্পষ্ট হল।

এই ভ্রামণিক সংস্কৃতি যারা বয়ে বেড়ায় তারা গরীব কাটুনি, অর্থাৎ ফসল-কেটে-বেড়ানো নারী পুরুষের সংসার। *আরণ্যক* উপন্যাসে দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে একদল কাটুনি এসেছে ফুলকিয়া বইহারে সর্ষে কাটতে। ফসল কাটার শ্রম ও অর্থাগমের অল্প কটা দিনে জমে ওঠে অরণ্য। গাড়ি-গাড়োয়ান-মারোয়াড়ি-মহাজন এবং হালুইকর-মেঠাইঅলা-ফিরিঅলার ভিড় হয়। তারা আসে ভিন্ দেশ থেকে। রং-তামাশা দেখিয়ে দু'পয়সা রোজগার করতেও কেউ কেউ আসে, সত্যচরণ সেটাও লক্ষ করেন। নাচ দেখানো, রাম-সীতা সেজে ভক্তের পূজা আদায়, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্তি হাতে পাণ্ডাঠাকুর—অরণ্যপটে যেন চলমান জীবনের নানা কুশীলবের ক্ষণ অভিনয়। সবই পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে। এই দীনতা বিভূতিভূষণের চোখে না-পড়ে পারে না, ক্ষমাশীল তাঁর অন্তঃকরণ কোন এক প্রসন্নতায় মেনে নেয় মানুষের বাঁচার সমূহ চেষ্টাকে।

ফুলকিয়া বইহারে পনেরো দিনের উৎসবে গরিব মানুষ সব খুইয়ে ফেলে কিন্তু খুব আনন্দ পায়। জমিদার ও মহাজনের পাইক পেয়াদারাও এসময় এসে জোটে এবং জোর করে খাজনা আদায় করে। সত্যচরণের কাছারিতে একদিন খবর এল, একটা লোক খাজনা ফাঁকি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাচ্ছে। তাকে ধরে আনলে দেখা গেল, 'মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।' এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ব্রাত্য মানুষের কাহিনি লিখছেন বলেই বিভূতিভূষণ পলাতক অপরাধীর মধ্যে প্রথমেই দেখতে পান বুভুক্ষু মানুষটাকে। প্রশ্নোত্তরে সে জানায় তার নাম দশরথ, মুঙ্গেরের সাহেবপুর কামালে তার সাকিন, জাতে 'ভুঁইহার বাভন'। সিপাইরা জানায় মেলার এ কদিন সে 'ননীচোর নাটুয়া' সেজে নাচ দেখিয়ে ভাল রোজগার করেছে, আজ তার খাজনা দেবার কথা, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তান দশরথ 'হনুমানজীর কিরিয়া' খেয়ে জানায়, 'কিছুই পাইনি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি।' শেষ পর্যন্ত জোর করে অনুসন্ধানে তার লুকানো গেঁজে থেকে

বেরোয় তেরো আনা পয়সা। এতেই নাকি সে আগামী গম কাটার মরশুম অর্থাৎ সামনের তিন মাস চালাবে। আট আনা খাজনা দিলে হাতে থাকে তার পাঁচ আনা। তাতে কি করে চলতে পারে তিন মাস?

গ্রামীণ লোকশিল্পীদের আর্থিক দুঃসহতা আমাদের দেশে চিরকালই একরকম রয়ে গেছে। শোষণের চেহারাও একই। ননীচোর নাটুয়া সেজে দু-এক পয়সা রোজগার, তাতেও খাজনার আবশ্যিকতা সত্যচরণের নরম মনকে ব্যথিত করেছে এমন আমরা ভাবতে পারি। লোকায়ত পাঠে যা ধরা পড়ে তা হল এই দৃশ্যটির অবতারণার চমৎকারিত্ব। যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন সেইখানে বিভূতিভূষণের পদক্রমা। আরণ্যকের সত্যচরণ অবশ্য খাজনা সমস্যার সহজ মীমাংসা করেন। দশরথকে বলেন, 'বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পার, নাচ দেখিয়ে যাও খাজনার বদলে।'

নাচের বিষয় ও মান অবশ্য হাস্যোদ্রেককারী। 'গালে মুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ওই বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল' সে এক অনর্থ। সত্যচরণ নাচের শেষে হাততালি দিলেন, প্রশংসা করলেন, খাজনা মকুব হল, এমনকি দু টাকা বখশিসও দিলেন।

আরণ্যক পড়তে পড়তে এক-একসময় মনে হয় সত্যচরণের কাছারির সামনের বনপথ যেন রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের চিরপ্রবাহী পথের মতো। পথ বেয়ে সেখানে কুশীলবদের আসা-যাওয়া যেমন, *আরণ্যক*-এও তেমন বহু মানুষের গমনাগমন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থিক মন্দা ও সামাজিক সংহতির ভেঙে-পড়া গ্রামের পর গ্রাম, বিহারের কুশী নদী ও কারো নদীর আশপাশের মানুষদের এক অনিশ্চিত ভ্রামণিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অনেকেই হারিয়েছিল তার জাতবৃত্তি। নানা উঞ্ছজীবী অস্তিত্ব তাদের জনপদজীবনে কোনও আশ্বাস ও স্বস্তি দেয়নি বলে তারা জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে ধরমপুর, সেখান থেকে পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ তাদের জীবনজীবিকার মরীচিকা পথ। মাঝখানে কাটুনিরা ক'দিনের গ্রাম্যসংস্কৃতির বয়ে-নিয়ে-আসা

শাখাপ্রশাখায় স্নাত হয়। মঞ্চী বলে সত্যচরণকে, 'বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন ঝাল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী।'

সত্যিই চমৎকার কিনা, বিভূতিভূষণ সে মন্তব্য সত্যচরণকে দিয়ে করাননি, কিন্তু দেখিয়েছেন গ্রাম্যসংস্কৃতির চলমানতা এবং ব্রাত্যজনের তাতে আনন্দ পাওয়ার সহজ উচ্ছ্বাসকে। পাশাপাশি দেখিয়েছেন অন্নরিক্ত অসহায় অরণ্যজীবী পূরণচাঁদের টিণ্ডেল বনঝাউ-বনের প্রান্তে বসে একমনে গায় : 'দয়া হোই জী'। ঔপনিবেশিক দেশে, শাসন শোষণে ত্রস্ত, বর্ণব্যবস্থায় বিপর্যস্ত গ্রাম্যমানুষ শেষপর্যন্ত কার দয়া চাইবে? বিভূতিভূষণ সে-প্রশ্ন না-তুলে অন্য একটা মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন তাঁর কথকের মুখে : 'আর ঠিক কি পূরণচাঁদের টিণ্ডেল ছট্টুলাল প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরে রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে ওই গানই গাহিবে—দয়া হোই জী'। এইভাবে গেঁথে তোলেন লেখক আবহমানের চিরচেনা অপরিবর্তনীয় লোকায়তকে।

গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির চলমানতার অন্য এক ধরন দেখি *আরণ্যক*-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায়। কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনে সত্যচরণ বেরিয়ে আসেন। জমাদার মুক্তিনাথ সিং বলে, 'হুজুর, দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে, লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়েছে। ওরা কাছারিতে হুজুরের সামনে নাচবে বলে এসেছে, যদি হুকুম হয় তবে নাচ দেখায়।' দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলে, —'হুজুর, হো হো নাচ আর ছক্করবাজি নাচ'।

আরণ্যক-এ এই প্রথম দুটি লোকায়ত নাচের ধরন সম্পর্কে পাঠকরা জানতে পারলেন।

ক্ষুধার জ্বালায় পথে-বেরোনো এই নাচের দল সম্পর্কে সত্যচরণের মন্তব্য বেশ দ্যোতক; 'দলটি দেখিয়া মনে হইল নাচের কিছু জানুক আর না-জানুক পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরনের, সব বয়সের লোক ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।' অনেকক্ষণ ধরে তাদের নাচ গান শেষ হলে সত্যচরণের মনে হয়; 'অদ্ভুত ধরনের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের

গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে এই দিগন্ত পরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গানই খাপ খায়।' এই মনে হওয়াটুকু ভারি সত্য উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। নিঃসীম নিসর্গ এবং নিভৃত বন্যতার সঙ্গে মানানসই এই ক্ষুৎপীড়িত নাচের দল একটা অন্য বিন্যাসে বিভূতিভূষণ গেঁথে তোলেন তাঁর মায়াময় রচনাসৌকর্যে। গানের ভাষা না-বোঝার জন্যই বোধহয় গানগুলি অদ্ভুত মনে হয়েছিল এমন বিশ্লেষণের সান্ত্বনা পান সত্যচরণ। কিন্তু 'এই পাহাড় ও পিয়ালবনের সুরে বাঁধা এদের গান, এখানেই ভালো লাগিবে' এ কথা আবার তাঁর মন মেনে নেয়।

সতেরো-আঠারোজন লোক নিয়ে নাচের দল অথচ তাদের দক্ষিণা মাত্র চার আনা। আমলারা একবাক্যে বলে, 'হুজুর, তা-ই অনেক জায়গায় পায় না, বেশি দিয়ে ওদের লোভ বাড়াবেন না, তাছাড়া বাজার নষ্ট হবে। যা রেট তার বেশি দিলে গরীব গেরস্তরা নিজেদের বাড়িতে নাচ করাতে পারবে না হুজুর।' লোকশিল্পীদের সম্পর্কে এই সীমাহীন অনুদারতা ও নির্মমতা সত্যচরণকে ব্যথিত করে। তিনি তাদের রাতে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পরদিন সকালে নাচের দলের সর্দারকে ডেকে দু টাকা দিলে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

এই নাচের দলের একটা বারো-তেরো বছরের যাত্রাদলের কেষ্টঠাকুরের মতো চেহারার ছেলে ধাতুরিয়া আলাদা করে সত্যচরণকে টানে। তার নাচের ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। 'একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারি শান্ত, সুন্দর চোখমুখ, কুচকুচে কালো।' তার গলার গানটি সত্যচরণের মনে গেঁথে যায় : 'রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যায় পরদেশিয়াঁ।' সত্যচরণ তাকে কাছে রাখতে চান। সর্দার তাকে নিয়ে যায় পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বেশ কিছুকাল পরে যখন রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে আবার ধাতুরিয়া ও সত্যচরণের সাক্ষাৎ ঘটান বিভূতিভূষণ তখন বোঝা যায় তাঁর এই চরিত্র সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ধাতুরিয়া অনেকটা বড় হয়ে গেছে, নাচেও অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন সে একক নর্তক। হোলিতে তাকে বায়না করে আনা হয়েছে।

স্বাবলম্বী লোকশিল্পী ধাতুরিয়া *আরণ্যক* উপন্যাসে একটা অন্য রকমের বাতাসের ঝলক এনে দেয়। রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে একক নাচগানের বিনিময়ে সে পাবে চার আনা এবং পেট পুরে মাড়া, দই, চিনি ও লাড্ডু। সত্যচরণ লক্ষ করেন, 'আসন্ন ভোজ খাইবার লোভে ধাতুরিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।' প্রশ্নোত্তরে জানতে পারেন, গাঙ্গোতাদের বাড়িতে নাচ গান করলে ধাতুরিয়া পায় দু আনা, খেতে পায় না কিন্তু আধ সের মকাইয়ের ছাতু মেলে। এই তা হলে তার জীবিকা! কী করে চলে তার? সে জানায়, 'বাবু, নাচে কিছু হয় না, আগে হত। এখন লোকের কষ্ট, নাচ দেখবে কে?'

লোকশিল্পীর এই অবমান ও আত্মপীড়ন কি বিভূতিভূষণকে মনে পড়িয়ে দেয় তাঁর কথক পিতা মহানন্দকে? *পথের পাঁচালী*-র হরিহর গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের পথে পথে, সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে আবেদন জানান : 'আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট করি—তাছাড়া ভাগবত কি গীতা পাঠও।' মহানন্দের আদলে গড়া হরিহর দাশু রায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুক-সারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের কথা ভাবেন। *পথের পাঁচালী*-র হরিহরের স্বপ্ন :

> 'ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত পদ রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূর দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোকে খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ি আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।
>
> 'বাঃ! চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া?—"কবির গুরুঠাকুর হরু—" হরু ঠাকুরের?
>
> —'না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।'

পথের পাঁচালীর হরিহরের এই স্বপ্ন বাস্তবের প্রহারে মিলিয়ে গিয়েছিল। তার রচনা, খাতাপত্রের বাণ্ডিল, বাক্সের অনাদৃত গুপ্ত কোণে লুকিয়ে থেকে হারিয়ে যায়।

আরণ্যক-এর ধাতুরিয়ার মরমী চিত্রণে বিভূতিভূষণ কি তাই হরিহরের স্বপ্নের জগৎকে আরেকবার টানতে চান? সত্যচরণকে ধাতুরিয়া বলে,

> যখন নাচের বায়না থাকে না, ক্ষেত-খামারে কাজ করি। আর-বছর গম কেটেছিলাম। কি করি হুজুর, খেতে তো হবে। এত শখ করে ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম গয়া থেকে—কেউ দেখতে চায় না, ছক্করবাজি নাচের মজুরী বেশি।

রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ি থেকে পূর্ণিমা রাতে প্রত্যাবর্তনের পথে ঘোড়সওয়ার সত্যচরণের পিছনে ধাতুরিয়া ছুটে আসে। তার রুদ্ধশ্বাস আবেদন : 'হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন?'

কেন কলকাতা যাবার এত আকুলতা? ধাতুরিয়া বলে, 'কখনও কলকাতায় যাইনি, শুনেছি সেখানে গাওনা বাজনা নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলতে বসেছি! উঃ কি করে ওই নাচটা শিখি! সে কথা শোনার জিনিস।'

লোকশিল্পীর এই অনাদর ও অন্তর্বেদনা বিভূতিভূষণ *আরণ্যক*-এ ইচ্ছে করে সংযোজন করেছেন। মটুকনাথের সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ, যুগলপ্রসাদের অনন্য পুষ্পপ্রীতি, মুসম্মত কুন্তার আত্মসম্ভ্রমবোধ, দোবরু পান্নার জাতিগত অহঙ্কারের পাশে ধাতুরিয়ার শিল্পপিপাসার বিপন্নতা অন্য এক দ্বন্দ্ব জাগায়। পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে বিভূতিভূষণ ধাতুরিয়ার মুখে তার নাচ শেখার দুরূহ অন্বেষার বিবরণ দেন এইভাবে:

> সবাই বলত গয়া জেলার এক গ্রামে ভিটলদাস বলে এক গুণীলোক আছে, সে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ। ...গয়া জেলাতে চলে গেলাম, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি আর ভিটলদাসের খোঁজ করি। কেউ বলতে পারে না। শেষকালে একদিন সন্ধ্যার সময় একটা আহীরদের মহিষের বাথানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে শুনলাম ছক্করবাজি নাচ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। ... যেমন ছক্করবাজির কথা কানে যাওয়া অমনি লাফিয়ে উঠেছি। কি খুশীই যে হলাম বাবুজী সে আর কি বলব! যেন একটা তালুক পেয়ে গিয়েছি! ...ওখান

থেকে সতেরো ক্রোশ রাস্তা তিনটাঙা বলে গ্রামে তাঁর বাড়ি।

তরুণ গ্রাম্যশিল্পীর শিল্প-এষণার কাহিনি, তার আবেগ ও আকুলতাসহ, হাজির করেন :

> হেঁটে গেলাম সেখানে। ভিটলদাস দেখি বুড়ো মানুষ। একমুখ সাদা দাড়ি। আমি বললাম, আমি ছক্করবাজি নাচ শিখতে এসেছি। তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এ তো লোকে ভুলেই গিয়েছে। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললাম, আমায় শেখাতে হবে, বহুদূর থেকে আসছি আপনার নাম শুনে। তাঁর চোখ দিয়ে জল এল। বললেন, আমার বংশে সাতপুরুষ ধরে এই নাচের চর্চা। কিন্তু আমার ছেলে নেই, বাইরের কেউ এসে শিখতেও চায়নি আমার এত বয়স হয়েছে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা, তোমায় শেখাব।

ধাতুরিয়াকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে যে কোনও সুরাহা হবে না সত্যচরণ তা বুঝে তাকে শুধু বলেন একদিন কাছারিতে আসতে। তাঁর মনে বোধহয় ইচ্ছা জেগেছিল ধাতুরিয়ার অনিশ্চিত এবং ভবিষ্যৎহীন ভবঘুরে জীবনের বদলে জমি দিয়ে পুনর্বাসন।

একদিক থেকে *আরণ্যক* উচ্ছেদ ও পুনর্বাসনের নানা মাত্রার উপাখ্যান। অবজ্ঞাত বনকুসুম থেকে নিরুপাধি প্রাকৃত মানুষকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠাদান এ-রচনার মূল লক্ষ্য। দেবী সিংহের বিধবা পত্নী কুন্তার ভিক্ষাজীবী জীবনের অবসান ঘটে সত্যচরণের সদিচ্ছায় জমি পেয়ে। রাজু পাঁড়ের মতো দার্শনিক স্বভাবের কিন্তু পরোপকারী সমাজসেবক তাঁর প্রশ্রয়ে জমি পায় প্রায় বিনামূল্যেই। প্রকৃতিপ্রেমিক যুগলপ্রসাদের সাহায্যে অরণ্যে পুনর্বাসিত করেন কত রকমের ফুল ও লতা। তিন বছর পরে এক বর্ষামুখর শ্রাবণদিনে ধাতুরিয়া কাছারিতে এসে বলে :

> বাবুজী, নাচ দেখাতে এলাম। বড় কষ্টে পড়েছি, আজ এক মাস কেউ নাচ দেখেনি। ভাবলাম, কাছারিতে বাবুর কাছে যাই, সেখানে গেলে তাঁরা ঠিক দেখবেন। আরো ভাল ভাল নাচ শিখেছি বাবুজী।

ক্ষুৎকাতর শিল্পীর অদম্য কলাসৃষ্টির চেষ্টাকে বিভূতিভূষণ এভাবে

সম্মান দেন। কেউ যার নাচ দেখে না তার কারুবাসনা কিন্তু মেটে না, সে আরও ভাল ভাল নাচ শেখে। আস্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি এমন আকুলতা, জাতিবৃত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার মরীয়া চেষ্টাকে সত্যচরণ আগে আরেকবার সম্মান দিয়েছিলেন সংস্কৃত টোল খুলে, জমি দিয়ে, ব্রাহ্মণ মটুকনাথকে। এ হয়ত মহানন্দ বা হরিহরের অন্য এক ধরনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ভ্রাম্যমাণ নর্তকজীবনের উৎকণ্ঠা ধাতুরিয়াকে আরও শীর্ণ করে দিয়েছে, সত্যচরণের বৎসল চোখে পড়ে। তাকে খেতে দেওয়া হয় দুধ চিঁড়ে। তার খাওয়া দেখে মনে হয় সে অন্তত দু দিন খায়নি। খেয়ে দেয়ে পরিতৃপ্ত ধাতুরিয়া সন্ধ্যার আগে নাচ দেখায়। বন্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে থাকে বিনোদনস্পৃহা। থাকে লোকনৃত্যের সমজদারী। তারা ভিড় করে নাচ দেখে, পয়সা দেয়। সত্যচরণের মনে হয় 'ধাতুরিয়ার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে।' পরদিন সকালে সে বিদায় নিতে এসে আবার তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার অভিলাষ জানায়। সত্যচরণ তাকে জমি দিয়ে স্থিতু করতে চান। ধাতুরিয়া বলে, 'আপনার বড় দয়া। কিন্তু চাষ-কাজ কি আমায় দিয়ে হবে? ওদিকে আমার মন নেই যে। নাচ দেখাতে পেলে আমার মনটা বেশ খুশী থাকে।' আপাতত সে তাই আট ক্রোশ রাস্তা হেঁটে ঝল্লুটোলায় এক ভুঁইহার বাভনের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে নাচ দেখাবার সম্ভাবনার পথে পা বাড়ায়। ঝল্লুটোলা থেকে ফিরে এসে জমির ব্যাপারটা ভাববে এমন কথা দিয়ে তবু বলে, 'এত মেহেরবানিই যখন করলেন বাবুজী, একবার কলকাতায় কেন নিয়ে চলুন না? ওখানে নাচের আদর আছে।'

ধাতুরিয়াকে কথক এই দৃশ্যের পর তাঁর উপাখ্যান থেকে বিদায় দেন। মাস দুই পর কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে রেললাইনে ধাতুরিয়ার ছিন্ন মৃতদেহের সংবাদ আসে। সেটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা সে প্রশ্নের নিরাকরণ হয় না। কিন্তু লেখক ফুটিয়ে তোলেন একজন শিল্পীর অভিমানী আত্মনিষ্ক্রমণের ব্যথাবেদনার নির্বেদ। সত্যচরণের স্মৃতিতে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা পায় যে ধাতুরিয়ার মধ্যে 'যে একটি নির্লোভ, সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের

মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়।' সম্ভবত আরণ্যক আখ্যানে এই মন্তব্য ব্রাত্য শিল্পজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে অদৃশ্য কিন্তু সমুজ্জ্বল এপিটাফ।

দেখতে দেখতে সত্যচরণের উদ্যমে নাঢ়া লবটুলিয়া তার শান্ত বনশ্রীর গায়ে গায়ে গড়ে তোলে কলকোলাহলময় ছোট জনপদ। সেখান থেকে চিরবিদায় নেবার সময় সত্যচরণ দেখতে পান : 'বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চিৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা।' এত রকমের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মকর্ম, সংস্কার ও বর্ণব্যবস্থা কিছুই চোখ এড়ায় না লেখকের। ছটপরবের আয়োজন, তার জন্য পিঠে বানানো, সেই পিঠে খাবার জন্য লালায়িত মানুষের অপরিমিত বদভ্যাস সবই আসে লেখার টানে। সত্যচরণ উপলব্ধি করেন এলাকার সব মানুষই যদিও হিন্দু কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার জায়গায় তারা একতম আসনটি ধার্য করেছে হনুমানজীর।

> প্রত্যেক বস্তিতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা ক্বচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশি আড়ালে ফেলিয়াছে।

এরপরে সত্যচরণ বলেন নিঃসঙ্গ শিবভক্ত দ্রোণ মাহাতোর কাহিনি এবং তার মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয় যেন কোনও লোকদেবতার জন্মবৃত্তান্ত। কাছারির কাছে বহুকাল আগে কে নাকি এক খণ্ড শিলা এনে রেখেছিল। দশ-বারো বছর সেটি প্রায় অনাদৃত হয়ে পড়েই ছিল। নতুন-আসা নিম্নবর্ণ দ্রোণ মাহাতো জাতে গাঙ্গোতা। সে কাছারিতে সেই অনাদৃত শিলাখণ্ডটি একদিন লক্ষ্য করে তার পরদিন থেকে কল্‌বলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান সেরে এক ঘটি জল এনে শিলাখণ্ডে ঢেলে সাতবার ভক্তিভরে সেটিকে প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম শুরু করল। এইভাবে প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম হল লোকদেবতা মহাদেওর। এক ক্রোশ দূরের নদী থেকে কষ্ট করে জল আনা কেন? সত্যচরণের এমন প্রশ্নের জবাবে দ্রোণ বলে, 'মহাদেওজী স্রোতের জলে তুষ্ট থাকেন বাবুজী।'

এক খণ্ড উপেক্ষিত শিলা এভাবেই লোকদেবতার আকার নেয় লোকায়ত মানুষের একান্ত বিশ্বাসের ছোট্ট জগতে। ব্রাত্য দ্রোণ মাহাতোর পূজিত শিব পল্লবিত কাহিনিতে নানা বস্তিতে ছড়িয়ে পড়েন, আরম্ভ হয় দু-পাঁচজন ভক্তসমাগম। ব্রাহ্মণ মটুকনাথ শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক শিবের এমন সহজ লোকায়ন মেনে নিতে পারে না, বিশেষত দ্রোণের নিরুপকরণ সেবাপূজা। সে সত্যচরণকে বলে, 'একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?' সত্যচরণ উত্তর দেন : 'পণ্ডিতজী, সেই গাঙ্গোতাই ওই ঠাকুরটিকে লোকসমাজে প্রচার করেছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি। কই তুমিও তো ছিলে, এক ঘটি জল তো কোনদিন দিতে দেখিনি তোমায়।' রাগের মাথায় খেই হারিয়ে মটুকনাথ বলে বসল, 'ও শিবই নয় বাবুজী। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পুজো পাওয়ার যোগ্য হয় না। ও তো একখানা পাথরের নুড়ি।' সত্যচরণ বলেন, 'তবে আর বলছ কেন? পাথরের নুড়িতে জল দিলে তোমার আপত্তি কি?'

সত্যিই উচ্চবর্ণের অস্বস্তি ও অসন্তোষ জয় করে মহাদেও পৌঁছে যান ব্রাত্যজনের সহজিয়া উপাসনায়। বিভূতিভূষণ সত্যচরণের জবানীতে কেবল একটি ক্ষিপ্র বাচন বুনে দেন : 'ভক্তও ভগবানকে গড়ে।'

'একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্যজীবনের ছবি' তাদের 'দারিদ্র্য সরলতা' সমেত আঁকতে চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ তাঁর *আরণ্যক* উপন্যাসে। লোকায়ত পাঠে সেই শৌর্যময় সহিষ্ণু একদল মানুষের বেঁচে বর্তে থাকা, তাদের প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই, বন্যজন্তুর সঙ্গে যুযুধান সম্পর্ক সবই পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কিন্তু সে সব অস্তিত্ব অরণ্যের বিশালতার পাশে, সর্বগ্রাসী বন-জঙ্গলের তুলনায় আর কতটুকু? তবুও মানুষের জিজীবিষা শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। বন কেটে বসত গড়ে ওঠে, যূথবদ্ধ মানুষ বানিয়ে নেয় কান্নাহাসির সমুচ্ছল জনপদ। সত্যচরণই সেই অরণ্য নিধন ও জনপদ উৎসের প্রধান স্থপতি। তাই উপন্যাসের শেষে সত্যচরণকে অনুতাপ মিশিয়ে বলতেই হয় : 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়।'

এই ক্ষমাভিক্ষা আসলে মানুষের জীবন থেকে মিথ ও লোকপুরাণের

বিনাশের জন্য। অরণ্যসংকুল পরিসরে নরনারীর যাপনগত যে-বিশিষ্টতা তা জনপদজীবন ভবিষ্যতে কেবলই ধ্বংস করবে। কে আর বিশ্বাস রাখবে মটুকনাথের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে? কে আর মানবে মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর প্রতাপকে? বিলীন হবে দোবরু পান্নার বীরত্বের শৌর্যের ইতিকথা।

আরণ্যক উপন্যাসে গোঁড় সাঁওতালদের একটা উপকাহিনি, দোবরু পান্না-জগরু ও ভানুমতীর, মূল আরণ্য প্রতিবেশে অতীত ইতিহাসের ছায়াময় নিবিড়তা এনেছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে আরণ্যক-বনাঞ্চলে একটা দুটো মানুষের মকাইয়ের ভুট্টা আর চীনা ঘাসের দানা খেয়ে দারুণ কষ্টে, তীব্র শীতে বেঁচে থাকা, বড়জোর একটা দুটো মহিষ চরানো—এ কোনও ইতিহাস নয়। এ হল আবহমান ভারতীয় দারিদ্র্যের উপলব্যথিত জীবনস্রোতের আখ্যায়িকা। বংশধারা, বহুদিনের বাস্তু এবং পারিবারিক শাখাপ্রশাখা মানুষের পরিবারে যেমন অহঙ্কার ও আত্মপ্রত্যয় আনে, আনে অতীত-বর্তমানের তুলনামূলকতা, লবটুলিয়া নাড়া-বইহারে কোনও মানুষের সেটা ছিল না। থাকা সম্ভবও কি? কোনওরকমে একটা-দুটো বিদেশাগত লোক গহন জঙ্গলে একাকী বেঁচে আছে, ভাগ্যান্বেষণে লড়ছে এমনই দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই পরিবারছুট, বাঁচার তাগিদে এসে-পড়া। তাই সত্যচরণ তাদের ব্যক্তিকাহিনি ও ব্যক্তিস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের কথা যত শুনিয়েছেন তাদের সামূহিক বা পরিবার পরম্পরার স্রোতকে তত ধরেননি। রাজু পাঁড়ে, বনয়ারীলাল, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, গণু মাহাতো, মটুকনাথ পণ্ডিত, জয়পাল কুমার, সুজন সিং, যুগলপ্রসাদ, গিরিধারীলাল এরা সব যেন বিছিন্ন মানবস্বভাবের এক-একটা আলাদা অস্তিত্ব। সকলের সঙ্গে সকলের মিলমিশ নেই, লেনদেনও নেই। আছে কেবল জাতিবর্ণগত পরিচয় ও সংস্কার যা জন্মসূত্রে পাওয়া। সেই বিচারে কেউ রাজপুত, কেউ গাঙ্গোতা বা দোযাদ এবং ব্রাহ্মণ। আসলে তাদের একটাই মূল পরিচয়—তারা দরিদ্র, ক্ষুৎকাতর ও জীবনপিয়াসী।

এদের জীবনকেই কি ব্রাত্য জীবন বলা যাবে? বলা গেলেও সেই ব্রাত্য মানসের অন্ধিসন্ধি কি ব্যক্তি বিভূতিভূষণ ততটা বিস্তারে জানতেন? পরিবার ও সমাজের শিকড় থেকে অর্জিত ধ্যানধারণা আর তার প্রতিপালন, নানা সংস্কার ও রিচুয়াল তাদের কতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কী তাদের বারব্রত ও পালুনী, সত্যচরণ সেই গভীরে যেতে পারেননি। নক্‌ছেদীর তরুণী পত্নী মঞ্চীর ছেলে বসন্ত রোগে মারা গেছে এবং সেই দুঃখে মঞ্চী গৃহত্যাগ করে চলে গেছে জেনে সত্যচরণ রাগ করেন কেন তাকে টিকা দেওয়া হয়নি। রাগটা স্বামী নক্‌ছেদীর ওপর। কিন্তু,

> সত্যচরণ জানে না, বসন্তের দেবী জগদম্বা গাঙ্গোতাদের আরাধ্য, মাসে দুই থেকে তিনবার জগদম্বার পূজা করে গাঙ্গোতারা (Risley, 1981: 269)। কেমনভাবে বুঝবে নক্‌ছেদী, সরকারের টিকার জোর জগদম্বার শক্তির চেয়ে বেশি? নক্‌ছেদী যে গাঙ্গোতা, এ কথা সত্যচরণ জানে। যেমন সে জানে, বিশুয়া, গণু, গিরধারীলালও গাঙ্গোতা। ম্যানেজারের সেই জানা, অচেনার বিস্ময় পেরিয়ে, বেশি দূর যায়নি। গাঙ্গোতাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভিত অবধি সেই পরিচিতি পৌঁছয়নি। (*বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*—রুশতী সেন। ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ৩০)

লক্ষণীয় যে বিভূতিভূষণের এ ধরনের অজ্ঞতা অনেকটা ঢাকা পড়ে যায় রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর পারিবারিক উপস্থাপনে। *আরণ্যক* কাহিনিতে একমাত্র এই গল্প, স্থিতু একটা সমাজ পরিবারের, যারা কোনও বয়ে-আনা সংস্কৃতি নিয়ে আসেনি। যাদের সঙ্গে অরণ্যের আদি শিকড়ের যোগ আছে। আছে বংশধারা, নিজস্ব লৌকিক বিশ্বাসের দেবতা, সমাধিক্ষেত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মিথ। উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনেরো দূরে বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গলের সন্ধানে এসে সত্যচরণ নিতান্ত আকস্মিকভাবে পেয়ে যান ওই সাঁওতাল পরম্পরার দিশা। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা দুটো বিকট খোদাই করা মুখ, অর্থাৎ টোটেমচিহ্ন দেখে স্থানীয় মানুষের সাহায্যে জানা যায় ওটি অসভ্য এক বুনো জাতির

রাজ্যসীমার নিশানদিহি খাম্বা। *আরণ্যক*-এ এই প্রথম পাঠকরা আদিবাসী জীবনের, এ দেশের ভূমিপুত্রদের মুখোমুখি হবেন এবং বিভূতিভূষণ তার ধরতাই দেন তাদের তৈরি লোকশিল্পের বিকট টোটেম মূর্তি দেখিয়ে। এই প্রথম এক নির্দিষ্ট গোষ্ঠিবিশ্বাসবদ্ধ আদি জনস্রোতের সম্মুখীন হবে *আরণ্যক*-এর পাঠকসমাজ, বিস্ময় ও অপূর্বকল্পিত বাস্তবের রেশ নিয়ে। এদের, এই কৌম রাজপরিবারের বিবরণ দিয়েই কথক আনবেন অরণ্যের প্রাক্ ইতিহাস এবং ভুলে যাওয়া ভারতীয় জীবনের কম্পন। সত্যচরণকে স্থানীয় মানুষটি বলে :

> রাজার বংশধর এখনও বর্তমান। ...এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড়, আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।

ক্রমে সত্যচরণ এবং পাঠকের জানা হয়ে যায় এই জাতি এককালে মুঘল সৈন্যের সঙ্গে লড়েছে। বীরের বংশ এদের—এখন অবশ্য হীনবল। ১৮৬২ (১৮৬২ তারিখটি সঠিক নয়। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*—রুশতী সেন। ১৯৯৩। পৃ ৪৩) সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে এদের সব পরাক্রম ও যোদ্ধৃত্ব অবসিত, তবে এখনও বেঁচে আছেন সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা, বর্তমানে যিনি এদের রাজা, দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত গরীব। 'কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।'

ব্রাত্য ভূমিপুত্রদের সম্পর্কে কতটা সম্ভ্রমবোধ ও মানবিক উচ্চ ধারণা ছিল বিভূতিভূষণের তার প্রমাণ মেলে যখন দোবরু পান্নার কাছে প্রথম সাক্ষাতের সময় সত্যচরণ সঙ্গে নেন রাজার জন্য নজরানা—কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগি। পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং কিন্তু সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলে, 'আপনি সেখানে কী যাবেন!... পাহাড়ী অসভ্য জাতের রাজা, তাই বলে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী! সে তেমন কিছু নয়।'

বুদ্ধ সিং-জাতীয় সভ্যতার অর্ধেক-মুখ-দেখা মানুষের মনে রাজকীয়তার অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে বৈভব ও প্রতাপ মিশে। বিভূতিভূষণের মতো যথার্থ সংবেদী মানুষের মনে দোবরু পান্না উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন শিকড়ের গভীর ঐতিহ্যে, দেশীয়তার গূঢ় সম্পর্কে। সত্যচরণের চোখে তাই দোবরুর নাতনি ভানুমতী তার নিটোল স্বাস্থ্য ও লাবণ্যমাখা মুখে ধরা পড়ে। তাকে দেখে সত্যচরণের একই সঙ্গে মনে হয়—'পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়' কিন্তু 'সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্ব পুরুষেরা এই আরণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল—সেই বংশের সে মেয়ে।' সে হয়ে যায় ভানুমতী।

সভ্য ইংরাজি শিক্ষিত জগতের প্রতিনিধি সত্যচরণের সঙ্গে আদি ভারতীয় জীবনের আবহমান মানুষ দোবরু পান্নার প্রথম সাক্ষাৎ দ্বন্দ্বে-দোলাচলে-বিস্ময়ে চমকপ্রদ। বৃদ্ধ রাজা বকাইন্ গাছের তলায় বসে গরু চরাচ্ছিলেন। সত্যচরণ মর্মান্তিক চমকে ভাবেন, 'এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন!' এরপরে পরতে-পরতে বিভূতিভূষণ খুলে দেন রাজার সৌজাত্য ও সম্মানবোধ, তাঁর আতিথেয়তা ও শৌর্যময়তা। চাষবাস আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে দোবরু খুব উন্নাসিকতার সঙ্গে উত্তর দেন :

> ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও একসময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সবচেয়ে গৌরবের। তীর-ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে; আমি কখনও ছুঁইনি।

হীনবল কিন্তু অহঙ্কৃত এই মানুষটি আরণ্যকের বৃক্ষজগতে একমাত্র বনস্পতি, যাঁর বিশ্বাসের ও প্রত্যয়ের জগৎ মাটির অনেকটা ভিতর পর্যন্ত বিস্তারিত। আহারপর্ব শেষ হলে রাজা জানান বনের মধ্যে পাহাড়ের ওপরে আছে তাঁদের রাজবংশের প্রকাণ্ড বাড়ির চিহ্ন এবং পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা লোকদেবতা, সেখানেই আছে রাজবংশের সমাধি। প্রতি

পূর্ণিমায় সেখানে রাজার যাওয়া একটা প্রচল। কৌতূহলী সত্যচরণ দোবরু পান্নাকে অনুসরণ করে পৌঁছন সেখানে, প্রাকৃতিক গুহায়, সেই গুহাপথ পেরিয়ে আসেন এক সমতলে যার চারিদিক ব্যেপে এক বিশাল বটগাছ এক বিঘা জমিতে তার বিস্তার। চারপাশে তার বাটনাবাটা শিলের আকারে অনেক সমাধি-স্মারক। 'সত্যই বটগাছতলাটায় দাঁড়াইয়া আমার মনে এমন একটা ভাব হইল, যাহা এতক্ষণ কোথাও হয় নাই' সত্যচরণের মনে হল। বটের দ্যোতনা অনবদ্য।

দোবরু পান্নার কাছে সত্যচরণ জানতে পারেন অরণ্যের লোকদেবতা টাঁড়বারোর মহিমা। এই দেবতা আরণ্যমানুষের লৌকিক বিশ্বাসের মর্মমূলে নিজের অদৃশ্য পূজাবেদী প্রস্তুত করে নিয়েছেন। তিনি না থাকলে নাকি শিকারীরা চামড়া ও শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন, এটাই সর্বজনিক ধারণা—সেই অরণ্য অধ্যুষিত বন্য জন্তুদের তিমিরপ্রদেশে। সত্যচরণের মনে হয় টাঁড়বারোকে সভ্য জগতে কেউ জানে না, মানেও না কিন্তু রাজগোঁড়দের জীবনপ্রণালীর পক্ষে এই দেবতা কল্পনা নয়, 'এই দেবতা সত্যই আছেন।'

দোবরু-জগরু-ভানুমতীর পর্ব উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে আনেন বিভূতিভূষণ—এতে তাঁর এক উদ্দেশ্য প্রবণতার পরিচয় আছে! এখনকার বিচারে হয়ত 'History from below' তিনি উন্মোচিত করতে চেয়েছিলেন, তাই প্রথম পরিচিতির পর সত্যচরণকে সদলবলে বিভূতিভূষণ আবার আনেন সেই কৌমসমাজে, ঝুলন উৎসবে সম্মেলক নাচের প্রাকৃত বর্ণোজ্জ্বলতায়। ভানুমতী ও তার সখীদের সঙ্গে গড়ে ওঠে সুন্দর সরস বাচন বিনিময়ের স্নিগ্ধ সম্পর্ক। তিন বছর পরে চিরতরে নাড়া-বইহার ত্যাগ করে চলে যাবার আগে সত্যচরণ দেখা করতে চান ভানুমতীর সঙ্গে। ইতিমধ্যে দোবরু পান্না মারা গেছেন। তখন একবার এসেছিলেন। সারাদিন নানা গল্পে ভ্রমণে আলাপে এবারে কেটে যায় সত্যচরণের। বিকালে ভানুমতীর সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে সত্যচরণের মনে হয় :

এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল,

ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মতো। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের এই ট্রাজিক অধ্যায় আমার সামনে ফুটিয়া ওঠে।

এমনতর আত্মসমীক্ষা সত্যচরণের ভাবনায় আরেকবার করেছিলেন বিভূতিভূষণ সাঁওতালদের সেই সমাধি প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। মনে হয়েছিল :

ভারতের যা কিছু ইতিহাস—এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এইসব গুপ্ত গিরিগুহায়,অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। ... আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি; বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছি।

তাৎপর্যপূর্ণ অর্ধপরিচয়ের এই সন্ধ্যা শেষ পর্যন্ত কোনও মিলনরাত্রিতে পরিণত হয় না *আরণ্যক* উপন্যাসে। অনুতাপ থাকে উচ্চবর্গের তরফে কিন্তু নিম্নবর্গকে আলিঙ্গনে বাঁধতে পারেন না বিভূতিভূষণ। বোধহয় শিক্ষিত ও লোকায়তে মেলানো অসম্ভব। সত্যচরণ তাই আরণ্যভূমিতে বসেই কেবল ভাবতে পারেন 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।' 'যদি থাকিতে পারিতাম' উচ্চারণে সাধ আছে কিন্তু যতটা আকুলতার আত্যন্তিক আবেগ থাকলে চিরতরে থেকে যাওয়া যায় ভালবেসে অরণ্যকে ও অরণ্যদুহিতাকে, ততটা নেই সত্যচরণের মানসে। শান্ত স্তব্ধ অরণ্যকে মানুষের কোলাহলতপ্ত জনপদে পরিণত করার পাপের ক্ষমা চেয়েছেন তিনি অরণ্যানীর আদিম দেবতাদের কাছে। কিন্তু অনেক বড় ঋণের অপরাধ সত্যচরণের থেকে যায় ভানুমতীর কাছে। শহর তাঁকে টানে, শাহরিক জীবনের মসৃণতা, তার বিত্তবৈভবপ্রতাপ তাঁকে ছিন্ন করে ভানুমতীর কাছ থেকে। ভানুমতী তাঁর

কাছে প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত চিরন্তন নারী হয়ে উঠতে পারে না কেন? *আরণ্যক* -এর লোকায়ত-পাঠ সাঙ্গ করার পর এই বেদনা বুক থেকে বুঝি যাবার নয়।

GRONTHO.COM

কবি উপন্যাসের লোকায়ত পাঠ

বাংলা ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার ধারা ও ধরন দুটোই অনেকটা বদলেছে, তার একটা কারণ আমাদের ছাত্রজীবনে মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় যে-একরকম সাহিত্য প্রবুদ্ধ সমালোচক ছিলেন এখন তাঁদের শ্রেণিটাই বোধহয় আর নেই। এঁরা, ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য রচনার ধারার সঙ্গে জ্ঞানযোগে সমৃদ্ধ ছিলেন। দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে রসের বিচারকে সর্বাগ্রগণ্য মনে করতেন। তুলনায় অন্য শিল্পের বিষয়ে (যেমন চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, চলচ্চিত্র, নৃত্য) ততটা বোধহয় সড়গড় ছিলেন না, অন্তত সাহিত্য বিচারে ওই সব সূত্রের প্রয়োগ তাঁদের কল্পনাতীত ছিল। পঞ্চাশের দশকে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যাঁদের কাছে সাহিত্যের পাঠগ্রহণ করে সাহিত্যবোধ গড়ে তুলেছি তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে কখনও তাঁর গানের স্বাতন্ত্র্য বা গান দিয়ে দ্বার খোলার গূঢ় ইঙ্গিতটুকুও দেননি।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তাঁর চিত্রকলার কথা কখনও উচ্চারিতই হত না। সাহিত্য বিচারে বা সাহিত্যের অন্তর প্রদেশকে উদ্‌ভাসিত করতে সমাজবিজ্ঞান বা সমাজ-নৃতত্ত্বের প্রয়োগ ভাবনা তাঁদের মাথায় আসেনি। তাঁদের কাছে পাঠ গ্রহণের ফলে আমাদের যেমন বিশ্লেষণশক্তি বেড়েছে, তুলনামূলকতার দক্ষতা এসেছে, নন্দনতত্ত্বের প্রসঙ্গ বেশি করে বুঝেছি, তেমনই মনের প্রতিবন্ধিতাও খানিকটা এসে গেছে। তাঁদের প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আচ্ছন্নতায় গ্রস্ত হয়ে আমাদের শিল্প পাঠের মুক্তমন খানিকটা বদ্ধ হয়ে গেছে।

এঁদেরই কাছে আমার তারাশঙ্করের *কবি* উপন্যাসের পাঠগ্রহণ ঘটেছিল। *কবি* পড়াবার কালে ঘুণাক্ষরে এঁরা তারাশঙ্করের *রাইকমল* বা

স্বর্গ-মর্ত আখ্যান দুটির কথা টানেননি, আসেনি *রাধা* উপন্যাসটির কথা। অথচ রাঢ়ের পরিব্যাপ্ত ও অনাহত চিরন্তন লোকায়তকে বুঝতে ওই রচনাগুলির পাঠ তো অনিবারণীয়। বাউল-বৈষ্ণব- শাক্ত-ফকির অধ্যুষিত বীরভূম, কবি-ঝুমুর-কীর্তন-তরজা-পালা কীর্তনের জনখণ্ড আলাদা করে বুঝিনি। শুধু কেঁদুলির মেলা নয়, ময়নাডাল, মল্লারপুর, নানুর, দুবরাজপুর, পাথরচাপুড়ির মতো লোকায়ত সমাজের খবর না জেনে *কবি* পড়া যে কতবড় অন্যায় তা এখন বুঝছি। বুঝছি, ওই সব অঞ্চল বারেবারে সরেজমিন প্রত্যক্ষণের পর। জানতে পেরেছি, বাউলদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জাত-বৈষ্ণবদের সনাক্ত করে, যাঁদের উপাস্য মনের মানুষ নয়—রাধামাধব। যাঁদের ঘরে ঘরে আছে যুগল বিগ্রহ। যাঁদের গোত্রনাম 'অচ্যুতানন্দ', আখড়াধারী বা বাবাজি দুই বর্গের বৈষ্ণবদের কথা না জানলে রাইকমলিনী আর বক-বাবাজির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ধরতাই পাওয়া সম্ভব কি? কবিগানের আসর আর ঝুমুর গানের আসরের আয়োজনগত পার্থক্য জানা চাই। বীরভূম ও তার সন্নিহিত মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলি ঘুরে জানতে হবে নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলিম জনপদে পাথরচাপুড়ির মারফতি ফকির দাতাবাবার ব্যাপ্ত মহিমা। বাউলদের নামে প্রসিদ্ধ কেঁদুলির মেলা যে আসলে জাত বৈষ্ণবদের তেরাত্তিরের পারণ আর রাধামাধবের টোরাকোটা মন্দিরবাসী বিগ্রহের দর্শন তার তাৎপর্য বোঝা চাই। বীরভূমের নানা গ্রাম্যদেবদেবী—চণ্ডী রঙ্কিনী কঙ্কালী—আরও কত কত লৌকিক দেবতার থান—ডাকিনী পিশাচী আলাভোলায় বিশ্বাসী গ্রাম্য মানুষদের কথা—অন্ধকার নিশীথিনীতে শ্মশানে শব সাধনা, তন্ত্রমন্ত্র পিশাচসিদ্ধি, ধর্মঠাকুর, বোলান গান, পটুয়া চিত্রকর, তীব্র গ্রীষ্ম, প্রখর রৌদ্র, খরা আর চৈতালি ঘূর্ণি মিলে-মিশে তারাশঙ্করের লোকায়ত।

কিন্তু এই পরিব্যাপ্ত লোকায়ত তারাশঙ্করের আবিষ্কৃত নয়, যাপিত। এইখানেই ব্যাপারটা খুব বড় তফাৎ তৈরি করে। তারাশঙ্করের অগ্রজ উপন্যাসকার বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* আর অনুজ সমরেশ বসুর *কোথায় পাবো তারে*-র ('কালকূট ছদ্মনামে লেখা) সঙ্গে *কবি* বা *রাইকমল* মিলিয়ে পড়লে ফাঁকটা ধরা পড়ে। বিভূতিভূষণ তাঁর *আরণ্যক* আখ্যানে লবটুলিয়া

নাড়া-বইহার বিহারী জনপদের যে-লোকায়ত মানবস্বভাব ও বিশ্বাসের জগৎ এঁকেছেন তা কল্পিত নয়, বাস্তব, কিন্তু ভ্রামণিকের চোখে দেখা যেন। এ সব অভিজ্ঞতা তাঁর চাক্ষুষ কিন্তু যাপিত নয়, এ-বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর জীবনের নাড়ির যোগ ছিল না। *আরণ্যক*-পর্বের পর আর কোনোদিন এ-লোকায়তের স্মৃতি বা সংস্কার তাঁকে উদ্বেল করেনি। কিন্তু *আরণ্যক*-এর কাহিনিবিন্যাসে আর বাতাবরণে এই লোকায়ন এত যে ওতপ্রোত তার কারণ লেখক হিসাবে বিভূতিভূষণের মুন্সিয়ানা! *আরণ্যক*-এর আখ্যানের সঙ্গে নিসর্গ যেমন অচ্ছেদ্য তেমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংসক্ত হয়ে আছে লোকবিশ্বাসের নানারকম পুঙ্খ চিত্রণ। সমরেশ বসুর পক্ষে ব্যাপারটা রীতিমতো বিব্রত হবার মতো মনে হয়, কারণ উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্রমিক-কেরানি-শিক্ষক-উদ্বাস্তু অধ্যুষিত যে-জনপদগুলি তাঁর এত চেনা ছিল, তার গঙ্গাতীরবর্তী মিশ্র সংস্কৃতি ও বাঙালি-ভোজপুরি জনবিন্যাস তাঁকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করলেও লোকায়তিক মানুষজন তেমন ভাবে তাঁর চোখে পড়েনি। পড়া সম্ভবও নয়, কারণ সব জনপদের বিন্যাস, ভূপ্রকৃতিগত স্বভাব আর মানুষের যাপনের স্বরূপ তো এক নয়। বীরভূম আর উত্তর চব্বিশ পরগনা সব দিক থেকেই আলাদা—জীবিকা ও জীবনেও। বাঁশবেদে, সাপের গুণীন, কবিয়াল, জাতবৈষ্ণবী, ঝুমুর গাওয়া পথবেশ্যা কিংবা আখড়াধারী বাবাজি বীরভূমের মতো সেখানে খুব সুপ্রাপ্য নয়। সেইজন্য সমরেশ বসুর আর্তি : *কোথায় পাব তারে* একদিক থেকে খুব দ্যোতক। এ আখ্যায়িকা তাঁর বড় অসহায় রচনা। এ বইয়ের অন্তর্গত গানগুলি তিনি তারাশঙ্করের মতো নিজে লিখে দিতে পারেননি, আবার আঞ্চলিক ভাবে সংগ্রহ করে নিতে পারেননি। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারি, *কোথায় পাবো তারে* উপন্যাসে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি গান পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি বাউল গানের সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত। সারা বইটাতে এই জোড়ের দাগ রয়ে গেছে, গানগুলি কাহিনির সঙ্গে অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের অধ্যবসায় ও শ্রমদানের তীব্রতা বোঝাতে তাঁর লেখা থেকে একটি উৎকলনই যথেষ্ট। *আমার সাহিত্যজীবন* বইতে লিখেছেন, গ্রামের সতীশ ডোমকে

('পাগলাটে কবি-যশঃ-প্রার্থী, আপনমনে পথেঘাটে কবিগান গেয়ে বেড়ায়') নিয়ে নিতাই কবিয়ালের চরিত্র সৃষ্টির ভাবনা তাঁর মনে এসেছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন

> এ চরিত্রটি নিয়ে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এ কবির কাব্য রচনা তো সহজ নয়। আটকে গেল। পুরো একবেলা চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ মনে এসে গেল, 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে?'...আমি সে সময়ে নিতাইয়ের মতই ভাবতে পেরেছিলাম। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে'—এই লাইনের সঙ্গে অনেক লাইন বেঁধেছি। 'কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা সঙ্গে ক্যানে?' অনেক লাইন। কিন্তু কেটে দিয়েছি'। ও নিতাইয়ের রচনা হয়নি।

একবারে সৎ স্রষ্টার অকপট কনফেশ্যন। শিক্ষিত তারাশঙ্কর (প্রথম জীবনে কবিতাও লিখতেন। বেরিয়েছিল *ত্রিপত্র* নামে অপটু কাব্য সংকলন) কী করে গ্রাম্য কবিয়ালের মতো লিখবেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে লিখতে পারলেন তার কারণ তাঁর দীর্ঘদিনের দেখার ও শোনার অভিজ্ঞতাই তাঁকে পথ বাতলে দিল। শিক্ষিত লেখকসত্তার সঙ্গে গ্রাম্য কবিয়ালের কবি-কল্পনার জগৎ মিলে মিশে গেল এবং বলা যেতে পারে তিনি নিতাইয়ের মতো অবলোকনের বিশেষ চোখ পেলেন। সতীশ ডোম যে-ভাষায় কথা বলত তা তাঁর বিলক্ষণ মনে ছিল। যেমন, 'রসিকের কথা রসিকে জানে/বংশী বাজে বৃন্দাবনে'। শুধু তো বাচন নয়, প্রবচনও তাঁর স্মৃতিতে ছিল। সহজ সরল উপমা, গ্রামীণ জীবন থেকে জেনে নেওয়া, বৈপরীত্যের নানা উপকরণ, যেমন—'কুকুরী আর ময়ূরী, সিংহিনী আর শূকরী, শিমুলে আর বকুলে, কাকে আর কোকিলে, ওড়না আর নামাবলী, রাধা আর চন্দ্রাবলী'। এসব তাঁর যাপিত জীবনের মূল্যবান অংশ। তেমন করে ততটা জানা যাবে না হয়ত, কিন্তু শিক্ষিত উচ্চবর্গের জীবনযাপনের অন্তরালে অনপনেয় স্মৃতির মতো জেগে থাকে লৌকিক অনুষঙ্গ, গ্রাম্য অভিজ্ঞতার দুর্লভ দিনগুলি। তারাশঙ্করের সেই সঞ্চয়ী মন পাদপূরণ করে নেয়—'কালো কেশে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে?' এ গান তিনি

লিখেছিলেন বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে বসে। আশ্চর্য যে এমন একটা গানের প্রথম শ্রোতা ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন প্রতিবেশী শিল্পী যামিনী রায়। একেই বুঝি বলে সমাপতন। তাঁর চিত্রকলাতেও তো গ্রামীণ পটের উজ্জ্বল পুনরুজ্জীবন!

২

তারাশঙ্কর বাস্তববাদী লেখক ছিলেন একথা সবাই বলেছেন। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসের পটভূমি তিনি চেনাজানা পরিবেশ দেখে-শুনে-জেনে তবে গড়ে তুলেছিলেন, অনেক চরিত্রও তাঁর চোখে-দেখা। এই দেখা কতটা নিবিড় ও নিখুঁৎ তার একটা বিবরণ আছে তপন সিংহের রচনায়। চিত্র পরিচালক তপন সিংহ তারাশঙ্করের *হাঁসুলিবাকের উপকথা*-র শুটিং-এর লোকেশন ঠিক করতে তারাশঙ্করের সঙ্গে বীরভূমের গ্রামের পর গ্রাম হেঁটেছেন। একদিন তারাশঙ্কর বলেন, 'তপন, তোমার সঙ্গে একটা বাজি ধরতে চাই। শুধু লাভপুরেই নয় আশেপাশের গ্রামে কতগুলো গাছ আছে আমি তা বলে দিতে পারি। ধরবে বাজি?' (তপন সিংহ: *মনে পড়ে* ১৯৯৫ পৃ.৭১)। শুধু প্রকৃতি বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ নয়, মানুষ সম্পর্কেও তাঁর পর্যুৎসুক চিত্তের পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যায়। অনেক সময় বাস্তবকে আরেকটু ফলিয়ে দেখানোর জন্য ছোট লেখাকে তিনি বড় করেছেন পুনর্লিখনে। *কবি, রাইকমল, রাধা* তিনটেই দুবার লেখা। *কবি* প্রথমে ছিল গল্প এবং তাতে ঝুমুর দল ও বসনের কাহিনি ছিল না। *কবি* উপন্যাস কেবল একটি আগে-লেখা গল্পের পরিবর্ধন নয়, নিতাইয়ের কবিসত্তার উন্মোচন ও ব্যক্তিসত্তার উন্মীলন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। ঝুমুর দলের গতিবিধি আর পথবেশ্যাদের নির্বিচার জীবনযাপন তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে জানা ছিল। শান্ত সুভদ্র নিতাইয়ের জীবন এদের সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে দেখল অন্ধকারের মুখ। তার মদ্যপানে দীক্ষা,

শরীরী কামনার উদগ্র চেহারা আর ঝুমুর গানের লৌকিক নগ্নরূপ এখান থেকেই পাওয়া। *কবি* উপন্যাসে লোকায়ন পর্বে ধরা পড়বে আরও নানা বাস্তবতা। সেসব বোঝবার আগে, রাইকমল সম্পর্কে একটি মন্তব্য লক্ষ করতে বলব পাঠকদের। *রাইকমল* প্রথমে আলাদাভাবে দুটি অংশে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম অংশ *রাইকমল* নামে বেরিয়েছিল *কল্লোল* পত্রে, দ্বিতীয় অংশ বেরিয়েছিল *উপাসনা* পত্রে *মালা-বদল* নামে। পরবর্তী কালে, ১৩৫২ সালে, তারাশঙ্কর যখন দুইখণ্ড একত্র করে যোগবিয়োগ করে অখণ্ড *রাইকমল* প্রকাশ করেন তখন ভূমিকায় লেখেন :

> মূলরূপের পরিবর্তন যখন হইলই তখন প্রথম দিকে—বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র রাঢ় দেশের কেন্দুবিল্ব এবং নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অজয়ের তীরভূমির কিছু পরিচয় প্রয়োজনবোধে যোগ করিয়া দিলাম। চালচিত্র না হইলে প্রতিমা মানায় না; স্থান ও কালের পটভূমি উপযোগী না হইলে পাত্র-পাত্রীর পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। পাঠকেরও বুঝিতে কষ্ট হয়।

কথাগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কেবল লক্ষ করার বিষয় এটাই যে পাঠকদের কথা তাঁর বিবেচনায় আছে, অর্থাৎ তিনি জ্ঞাপকতায় উৎসাহী। একটা কাহিনিকে কেবল পাত্রপাত্রী দিয়ে উপস্থাপন করা তাঁর লক্ষ্য নয়; সেইসঙ্গে বিশেষ কোনো জনপদের আন্তরস্বভাবকেও তিনি ধরতে চান। বিশেষভাবে *রাইকমল*-এর বৈষ্ণব বলয়ের চরিত্রাবলি জাত ও বিকশিত হতে পারে রাঢ় দেশের সুনির্দিষ্ট এক ভূখণ্ডে—যা বীরভূম থেকে বর্ধমান জেলা পর্যন্ত বিস্তারিত। অজয়ের তীরে তীরে গড়ে ওঠা বহু শত বছরের লৌকিক বৈষ্ণব পরিমণ্ডল যার পরিপোষক। *কবি* উপন্যাসেও দেখি ঝুমুর দলের গতিপথ 'আলেপুর থেকে কান্দরা, কান্দরা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপে।' এ সবই মহাপ্রভুর পদরজধন্য জনপদ, বৈষ্ণব লোকায়নে নিষিক্ত। এমনতর জায়গার বর্ণনা তারাশঙ্কর অখণ্ড রাইকমল পরিবর্ধন করার সময় সংযোজন করেছেন এইভাবে :

> পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ।
>
> এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য

আছে। পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এমনকি যেদিন 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু' হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিনেরও অনেককাল পূর্ব হইতেই এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা 'ধীর সমীরে যুমনাতীরে' যে বাঁশি বাজে, তাহার ধ্বনি শুনিয়াছে। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম-শুকপাখি ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে তখন হইতেই জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষেও জানিত, 'সুখ দুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই'। লোকে কপালে তিলক কাটিত; গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত; আজও সে তিলক-মালা তাহাদের আছে। পুরুষেরা শিখা রাখিত, আজও রাখে; মেয়েরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধিত।... এখনও মেয়েরা দিনান্তে অন্তত একবারও চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। আজও রাত্রে বাঁশের বাঁশির সুর শুনিলে এ অঞ্চলের এক সন্তানের জননী যাহারা, তাহারা আর জলগ্রহণ করে না। পুত্রবিরহবিধুরা যশোদার কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায়। হলুদমণি পাখি—বাংলাদেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে। এখানে আসিয়া তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়—। 'কৃষ্ণ কোথা গো' বলিয়া ডাকে।

রাইকমল গল্পটিকে তারাশঙ্কর যখন উপন্যাসে রূপ দিলেন তার সূচনায় ওপরের বর্ণনাটি কেন যে যোগ করলেন নতুন করে লিখে, তা পাঠকদের বোঝা দরকার। এক বিশেষ জনপদে আঞ্চলিক ভাবে বহুদিন ধরে নানা বিশ্বাস ও সংস্কার কেমন ভাবে বেঁচে থাকে লেখকের খর দৃষ্টি তা দেখতে ও দেখাতে ভোলেনি। লক্ষণীয় যে এই ঐতিহ্যের ধারাকে তারাশঙ্কর জয়দেবের আমল অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে টানতে চেয়েছেন—অর্থাৎ তাঁর বলার কথা, এমনতর দৈনন্দিন আচরণগত লৌকিক বৈষ্ণবতার ধরন গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রভাবে শুরু হয়নি। এর সূচনা অনেক আগে এবং বহু দিনের কৃষ্ণায়নের ঐতিহ্যে লালিত। গৌরচন্দ্রের প্রভাব এ-জনপদে নেই,

কারণ এখানকার নরনারী মূলত রাধাকৃষ্ণভাবে ভাবিত যা ব্রজবাসীর জীবনপ্রণালীর ঘনিষ্ঠ। গৌড়ীয় সাধনায় এমন ঘটে না, সেখানে সখীদেরও সখী মঞ্জরীভাব। তারাশঙ্কর যে-কথাটি এর সঙ্গে সংযোগ করতে পারতেন তা হল এইসব অঞ্চলে 'জাতি বৈষ্ণবদের' ঘরে ঘরে আজও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ বা পট, তার নিত্যপূজা হয়। তবে তারাশঙ্কর দেখাতে ভোলেননি রাঢ়ের এই বিশেষ অঞ্চলে পুত্রবতী রমণীদের যশোদাভাবের নিজস্বতা ও রাতে বাঁশির শব্দ শুনে উপবাসের আচরণগত নিয়ম। হলুদমণি পাখির ডাক বদলে যাওয়ার কল্পনা তো অনবদ্য। বস্তুত লোকায়ত বৈষ্ণবতার মাটির তিলক, ভূমিজাত তুলসীর মালা আর ছোট গৃহাঙ্গন যেন পরিপূরকের মতো। এঁরা মাটির সংলগ্ন থাকতে ভালবাসেন। এঁদের কৃষ্ণময়তার বিশ্বাসের আকাশে পাখির ডাকেও বিস্ময় পরিকীর্ণ।

রাঢ়ের এমন ঐতিহ্যসেবিত জনজীবনের ছন্দ, তার আচার আচরণ, বাগ্‌বিধি, গান আর প্রকৃতিময়তা কতটা অনাবিল ও অনাহত উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় তারাশঙ্কর সেটা জানিয়ে দেন ;

> চাষীর গ্রামে সদ্‌গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা-তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, 'প্রভু' বলিয়া সম্মোধন করে। ভিখারীরা 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবেরা খোল-করতাল লইয়া আসে; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা- খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা একা আসে একতারা বাজাইয়া। মুসলমান ফকিরেরা পর্যন্ত বেহালা লইয়া গান গায়—পুত্রশোকাতুরা যশোদার খেদের গান।...লোকে শখ করিয়া মালতী মাধবী ফুলের চারা লাগায়। প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে।

সমাজবিজ্ঞান যাকে 'প্যারাম্বুলেটিং কালচার' বলে, এতো তার পূর্ণাঙ্গ ছবি। সবাই এখানে আসছে আর চলে যাচ্ছে—বৈষ্ণব বাউল ফকির—গানের ধারা বেয়ে। মালতী মাধবী কদম গাছ, তাদের পুষ্পময় উদ্‌ভাস যেন প্রস্ফুট করে একটা আলাদা বাহিত চেতনা। রাইকমলিনী আর তার মা-র কুঞ্জকুটিরের পাশে এসে আখড়া বাঁধে রসিকদাস বাউল। কিন্তু

অচিরে তারা পথের বিবাগী হয়ে যায়। নানা অভিজ্ঞতার পরে বক-বাবাজি আর রাইকমল কিন্তু ফেরে তাদের সেই বাস্তু গ্রামেই।

সংস্কৃতি তার গ্রামীণ স্মৃতি নিয়ে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকে, শিকড়ে, তাই শেষপর্যন্ত কাউকে কাউকে ফিরতে হয় নিজস্ব জীবন ও সমাজের মায়াডোরে। *কবি* উপন্যাসে নিতাইয়ের জীবন যখন লীলাসঙ্গিনী বসনকে হারিয়ে রিক্ত ও হতাশ্বাস তখন সে মনের শমতা ফিরে পেতে কাশীতে গেল। সেখানে অবাঙালি পরিমণ্ডলে তার দেশজ মন শান্তি পেল না, তার রচিত বাংলা গানের সমাদরও কেউ করল না। এই সময় কাশীবাসী বিধবা রাঙা মা নিতাইকে আশ্রয় দিলেন নিজের বাসা বাড়িতে। এই নতুন মা নিতাইকে কেবলই জিগ্যেস করেন :

> তোমাদের গ্রামের কাছে নদী আছে বাবা? বড় দীঘি আছে গ্রামে? দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে? নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে? কলমীশুশুনীর শাক হয় বাবা?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে উদ্বেল প্রবাসী হৃদয় পেতে চায় যেন মন-কেমন-করা দেশজ সান্ত্বনা। শিকড়ভ্রষ্ট নিজ সমাজ-হারা মানুষ বুঝি এমন আকুল হয়ে পেতে চায় তার দেশের গন্ধ এত অনুপুঙ্খে? রাঙা মা-র প্রশ্নের আর শেষ নেই। রাঙা মা খানিক পরে আবার বলেন:

> পানের বরজ আছে? কেয়া-র গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোড়ায়? নদীর ধারে শামুক ভাঙা কেউটে থাকে? গাঙ শালিক আছে? 'বউ কথা কও' পাখি আছে? থাকবেই তো? 'চোখ গেল' অনেক আছে না?
>
> এতশত প্রশ্নের পর 'হঠাৎ মায়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।...দেখিতে দেখিতে ফোঁটা দুই জল যেন আপনা-আপনি চোখ ফাটিয়া বাহির হইয়া টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।'

কেন এই কান্না? সে কি সেই ফেলে-আসা জীবনের জন্য, না ফেলে-আসা গ্রাম্য কৈশোরক দিনের খুঁটে খুঁটে দেখা প্রকৃতিময়তার জন্য? পরবর্তী সম্প্রসারণে দেখা যাচ্ছে রাঙা মা স্মরণ করছেন কেবল প্রকৃতির খুঁটিনাটি নয়, বাল্য কৈশোরের নানা স্মৃতি ও গান। মনে পড়ে

তাঁর অন্তিম বয়সে এসেও:

> কবিগান হত পুজোয়। দুর্গাপুজোয় হত যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা, শখের যাত্রা। নীলকণ্ঠের গান 'সাধে কি তোর গোপাল হতে চাই গো? শোন যশোদে'! সে সব গান কি ভুলবার? মনসার ভাসান গান হত মনসাপুজোয়। চব্বিশ প্রহরের সময় কীর্তন হত। বাউল বৈরেগীরা খঞ্জনী একতারা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করত—'আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া'। আহা-হা!

প্রবাসী মানুষটা কঁকিয়ে ওঠেন লৌকিক জীবনের চোখ ছলছলে স্মৃতির রোমন্থনে। এসব অনুভূতি তো আসলে তারাশঙ্করের নিজের। এইভাবে রাঙা মা-র মুখে বসিয়ে তিনিই শুনিয়ে দেন চমৎকার এক অন্তঃপুর-থেকে-উঠে-আসা কথন:

> মা যশোদা গোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাটছিলেন। বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গড়লেন এক পাখি। সেই পাখির মাথায় ঝরে পড়ল—তাঁর চোখের এক ফোঁটা জল! সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো—আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত, সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল। পাখিটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—পাখি, তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায়। পাখি ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল 'কৃষ্ণ কোথা রে?' 'কৃষ্ণ কোথা রে?'

তারাশঙ্করের লেখনীকুশলতা যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই রাঙা মা-র স্মৃতি রোমন্থনের আয়োজন করেছে তা ধরা পড়ে কাহিনি বিন্যাসের পাঠান্তরে। ঠাকুরঝিকে পায়নি নিতাই, বসনকে চিতায় পুড়িয়ে এসেছে। নিঃশব্দ দিশাহীন তার কবিসত্তা আর নতুন গান বানাতে পারে না, এত রিক্ততা তার মনজোড়া। কাশীর পথে পথে সঙ্গবিহীন পথ পরিক্রমা, তার রচা বাংলা গানের অনাদর দৃশ্য এঁকে লেখক আসলে ধরতে চান তার শূন্যতার অতল। একজন ধর্মার্থিনী নারীর পরামর্শে নিতাই এবার প্রসাদী গান ধরে:

> আমার কাশী যেতে মন কই সরে?
> সর্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

কিন্তু গানটি শেষ হতেই তার মন বিকল হয়ে গেল। অন্তরের গভীর বেদনা আর ঔদাস্যে তার মনে পড়ে গেল তার নিজের গ্রাম্য দেবী মা চণ্ডীকে। এতদিন কবির দলের মত্ত আসঙ্গে, গানে গানে এবং বসনের কামনা ও প্রেমের পাকে নিতাই ভুলে গিয়েছিল তার উৎস। রামপ্রসাদী গান গাইতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল, 'রামপ্রসাদের এলোকেশীর মতো মা চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশেপাশে ফিরিতেছেন।' মনে হল সেই মায়ের পিছু পিছু ফিরছে বসন, ঠাকুরঝি, রাজন, বিপ্রপদ, কবিদলের মাসি, বেহালাদার—সবাই। তারপরেই নিতাইয়ের মনে হল, 'কাশীর চেয়ে তাহার গ্রাম ভাল'। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রাঙা মা-র পরামর্শ, 'কবিয়াল তুমি, দেশে ফিরে যাও'।

পরামর্শটি খুব দ্যোতক—'তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা।...দেশে তোমার কদর হবে'। *কবি* উপন্যাসের শেষ কথা এইটাই, নিজের জনপদে ফেরা, নিজের লোকায়ত সমাজে, যে-সমাজ তাকে কবিয়াল করেছে উৎসাহ দিয়ে সমজদারি করে। কাশীতে তার নিজেকে কেবলই ছিন্ন একাকী মনে হচ্ছিল। অপরূপ বিশ্লেষণে তারাশঙ্কর উদ্‌ঘাটিত করেছেন নিতাইয়ের প্রবাসী মানস এই চিন্তায় যে:

> সমস্ত দিনের মধ্যে পাখির ডাক সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু 'বউ কথা কও' বলিয়া তো কেউ ডাকে নাই; 'চোখ গেল' বলিয়া তো কোন পাখি ডাকে নাই—'কৃষ্ণ কোথা রে' বলিয়াও তো কোনো পাখি কাঁদিয়া ফেরে নাই এখানে।

এবার তার আবার মনে পড়ল গ্রামের একান্ত আপন মা চণ্ডীকে—যাকে গান শুনিয়ে একদা তার কবিত্বের বোধন হয়েছিল। মা চণ্ডীর অনুষঙ্গে নিতাইয়ের মনে পড়ে যায় বুড়োশিবকে—পাগলিনী খ্যাপা মা আর ভাঙর ভোলা। হু হু করে মনে পড়ে শৈশব থেকে শোনা ভোলা আর চণ্ডীকে নিয়ে ভক্ত্যাদের গাজনের গ্রাম্য নাচ আর গান:

> ওমা দিগম্বরী নাচ গো।
>
> হাড়ের মালা গলায় ভোলা নাচে থিয়া থিয়া।

ফেলে-আসা গ্রামীণ দিনগুলি, তার কতরকম লোক উৎসবের জাগ্রত

স্মরণিকা তাকে ব্যাকুল করে দেয়। টাটকা ছবির মতো নিতাইয়ের বাষ্পাকুল চোখের সামনে ঘুরে ঘুরে যায়, যেন বীরভূমের জড়ানো পট। সে দেখে:

> পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-জাপুর উৎসব। ঢাক শিঙা কাঁসির বাজনার সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্তদলের নাচ। গভীর রাত্রে বাগানে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ; বাবুদের পুরানো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মতো গোখুরার বাস; গোখুরাগুলা ডালে ডালে বেড়ায়, দোল খায়; কিন্তু ভক্তরা যখন 'জয় ধর্মরাজা' বলিয়া রোল দিয়া গাছে চড়ে, তখন সেগুলা সন্তর্পণে কোথায় গিয়া লুকাইয়া পড়ে। বাগানের সেই পুরানো বটগাছতলায় অরণ্যষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল। আল-পথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড়চোপড় পরা সারিবন্দী মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।... ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের 'বারো-মেসে' গানের কথা মনে হইল।
>
> বৈশাখে সূর্যের ছটা—
>
> যত সূর্য-ছটা, কাট ফাটা তত ঘটা কালবৈশাখী মেঘে—
>
> লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্য চাষ-ক্ষেতের লেগে।
>
> পুণ্য ধরম মাসে—
>
> পুণ্য—ধরম মাসে—ধরম আসে—পূর্ণিমাতে (সবে)—পূজে ধর্মরাজায়—
>
> আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়।
>
> তারপর জ্যৈষ্ঠ আসে—
>
> জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষতলে, মেয়ের দল অরণ্যষষ্ঠী পূজে—
>
> জামাই আসে, কন্যা হাসে, সাজেন নানান সাজে।।

গ্রাম্য জীবনের কবেকার বারোমাস্যা গানের স্মৃতি নিতাইকে চাঙ্গা করে। নিসর্গ আর নারীসম্পৃক্ত লৌকিক পার্বণ ব্রতের চিরায়ত প্রবাহ তার রক্তে দোল খায়। সেও তো রাঢ়ের লোকব্রতের সন্তান। এ সব উৎসবে পারণে তারও একটা ভূমিকা ছিল। কবিয়াল সে, সেইখানে তার প্রকৃত সৃষ্টির

মানসভূমি। শোভাযাত্রার মতো তার মনে পড়তে থাকে 'আষাঢ়ের পর রথযাত্রা—বর্ষার বাদল—অম্বুবাচীর লড়াই, শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধানভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজীর আখড়ায় ঝুলন-উৎসব দেখার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্যন্ত'। চকিতে তার সুপ্ত কবিত্বশক্তি ফিরে আসে। মনের আবেগে মুখে মুখে সে রচনা করতে থাকে এক নতুন টাটকা বারোমাস্যা,

বছর শেষে—চৈত্র মাসে—

বছর শেষে, চৈত্র মাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পূজার টাটে।

ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটছে শুধু মাঠে।

কোনো শহুরে মানুষের যাপনের স্মৃতি এত প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ হয় না। ফসল ফলানো মাঠের এমন সিক্ত বারোমাস্যা অনেক অভিজ্ঞতা থাকলে তবে লেখা যায়। চৈতি ফসল উঠে গেলে নাঙ্গা মাঠে হেসে ওঠে তিল ফুল এ দৃশ্য তারাশঙ্করের দেখা। তাঁর নিতাই শুধু তার কবিয়াল।

এবারে নিতাইয়ের বাড়ি ফেরার পালা। ট্রেনে এসে বর্ধমানে গাড়িবদল। নিতাই ভাবছে, 'ঘণ্টা দুয়েক মাত্র, তাহার পরেই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে। মা চণ্ডী, বুড়ো শিব।' তার মানে গ্রামে প্রত্যাবর্তন তার কাছে ভিটেমাটি স্বজন বন্ধুর কাছে ফেরা নয়, এমনকি ঠাকুরঝির কাছেও নয়। গ্রামপালক দেবতার কাছে ফেরা। ঘরে ফেরার উদ্বেগ আনন্দ চঞ্চলতায় সেইজন্য নিতাই অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে আগে সে তো কবিয়াল, তাই, 'তাহার গান রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে পৌঁছিয়াই সে সর্বাগ্রে মা চণ্ডীর দরবারে যাইবে প্রণাম করিতে। সেই প্রণাম করিবার জন্য সে গান রচনা শুরু করিয়াছে। এই গান গাহিয়াই সে মাকে প্রণাম করিবে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী নয়, সে নিজের গান গাহিয়াই মাকে প্রণাম করিবে।

সাড়া দে মা—দে মা সাড়া,

ঘর পালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভূঁই পাড়া।

ট্রেন চলেছে। বোলপুর ছেড়ে কোপাই, তারপর, তারপর জংশন; ছোট লাইন। নিতাইয়ের ভেতরকার আবেগের উথালপাথাল আর ছোটো

ট্রেনের কাঁপন যেন একছন্দে বাজে। স্বভূমিতে ফেরার আর্তিতে নিতাইয়ের চোখে জল আসে 'অজয়ের বানের মতো'। সে নিরুচ্চারে বলে—'মাগো—মা, আমার মা। আমার গাঁ।' অসামান্য অপূর্ব এ ভাবনার শিল্পিতা। নিতাই চলমান ট্রেন থেকে উচ্ছ্বাস ভরে দেখে—'ওই যে—সেই 'নিমচের জোল' 'উদাসীর মাঠ'; —ঐ যে কাশীর পুকুর; —ওই যে সেই কালী-বাগান—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহার কবি-জীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল।'

কাশী থেকে নিজের গ্রামে ফেরা, বাইরের থেকে নিজের দিকে ফেরা যেন। সেই ফেরাও সরাসরি নয়, প্রথমে বড়ো এক্সপ্রেস ট্রেনে বর্ধমান পর্যন্ত, তারপরে ট্রেন পালটে বোলপুর হয়ে, কোপাই হয়ে, ছোট ট্রেনে জংশন। যেন বৃত্তটা ক্রমে ছোট হচ্ছে—বৃহত্তর জগৎ থেকে লোকায়তের পরিধি বলয়ে—ছোট হতে হতে শেষে সেটা গিয়ে দাঁড়াবে গ্রাম্য দেবী চণ্ডীতে। আবার উল্‌টো দিক থেকে দেখলে 'আমার গাঁ আমার মা' এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত। নিজের ছোট গ্রামখানি তার সমস্ত ভূমি-প্রকৃতি-ব্রত-পার্বণ-বারোমাস্যা নিয়ে নিতাইকে মায়ের মতো টানে, কেননা এই মায়ের কোলেই তো তার লালন পালন, কবিয়ালীর দীক্ষা। লক্ষ করলে দেখা যাবে *কবি* উপন্যাসে তারাশঙ্করের বহু বর্ণনা ও উপমা তাঁর নিজের গ্রামজীবনের দৈনন্দিন থেকে উঠে এসেছে। পাতা উল্‌টোতে উলটোতে যেমন-যেমন চোখে পড়ছে এখানে উল্লেখ করছি,

ক. নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না,—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল বাঁধভাঙ্গা জলাশয়ের জলের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর ভেজা পাঁকের মতো জনশূন্য মেলাটার থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলো।

খ. ওদিকে আর একদল গ্রাম্য জমিদার একেবারে খড়ের আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

গ. ঠাকুরঝি যেন কাজলদিঘির জল! ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া উঠে; আবার মেঘ উঠিলে আঁধার হয়—কে যেন কালি গুলিয়া দেয়।

ঘ. বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নূতন কচি পাতার মতো।

এই বর্ণনা বা উপমা-উৎপ্রেক্ষার ভিতর থেকে জেগে উঠছে লেখকের গ্রামবাসের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের চকিত চোখ। বনে জঙ্গলে কীট পতঙ্গ কত থাকে, উড়ন্ত প্রজাপতি থাকে চঞ্চল ফড়িংও থাকে, আবার কেন্নুইয়ের মতো প্রাণী থাকে, যারা বুকে হেঁটে অজস্র পায়ের বিস্তারে মাটি আঁকড়ে চলে। মাটিকে তারা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতার তাপে জানে। তারাশঙ্করও এতটা নিবিড়তায় গ্রামকে জানতেন। স্বাদে বর্ণে গন্ধে রসে গ্রামকে তিনি আঁকড়ে ছিলেন তাই তার প্রকৃতি ও প্রবচন তাঁকে আহরণ করে আয়োজন করে *কবি* লিখতে হয়নি।

উপন্যাসের আরও দুটি বর্ণনা দেখাব। নিতাই আপন মনে গান বেঁধেছিল 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো কেনে'। এ গানের মধ্যে শরীরী হয়ে আছে ঠাকুরঝি—কালো কেশ রাঙা কুসুম, এই বর্ণনা তাকে দেখেই রচিত। গানটি নিতাই নিজেই গাইত, ঠাকুরঝিকে শোনাত। ঠাকুরঝি গানটা শুনে রাগ অভিমান করেছিল। কিন্তু তার স্বভাব কবিত্বের অসামান্য পারিতোষিক নিতাই পেল একদিন আশ্চর্যভাবে—তার বর্ণনা;

> 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'—গুনগুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে। ওই ঝোপটার আড়ালে; কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। মুহূর্তে ভাঁটার নদীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া গেল। ঠাকুরঝি! তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছে ঠাকুরঝি।

এ-ঘটনা নিতাইয়ের জীবনে, তার কবিত্বের এক মস্ত বড় স্বীকৃতি, তার সবচেয়ে গোপন পুরস্কার। 'কালো যদি মন্দ তবে' শুনে ঠাকুরঝি তাহলে রাগ করেনি, তার পছন্দ হয়েছে, এমনকি এতটাই মনে ধরেছে যে সে নিজে গাইছে? এমন অন্তরালের দৃশ্যে নিতাইয়ের মন কতটা উথালপাতাল তা বোঝাতে তারাশঙ্কর বলেছেন, যেন ভাটার নদীতে ষাঁড়াষাঁড়ির বান। এমন বর্ণনা বা উপমা নাগরিক মনে আসা কি সম্ভব?

উপন্যাসের গোড়ার দিকের আরেকটা অংশ—অট্টহাস গ্রামের

বাৎসরিক মেলায় কথা ছিল নোটন দাস আর মহাদেব পালের কবির লড়াই হবে। মহাদেবের দল হাজির, হাজার কয়েক শ্রোতাও উপস্থিত, কিন্তু হঠাৎ জানা গেল নোটন আসবে না। বিপর্যস্ত বিমূঢ় কর্তৃপক্ষ কী করেন? শেষমেষ একজনের উপস্থিত বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত হয় গাঁয়ের নিতাইকে দিয়েই সেদিনকার মতো সামলাতে হবে। উদ্যোক্তা বাবুসম্প্রদায়ের একজন ভূতনাথ—'সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে বেটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক। কাক—কাকই সই। তোর গানই শুনি।'

গ্রামীণ বাচনের কী অন্তর্ভেদী শক্তি। কাক কেটে অমাবস্যা—একটি গ্রাম্য প্রবাদ, কিন্তু এখানে তার লাগসই ব্যবহার তারিফ করার মতো। ভূতনাথের পরিহাসপূর্ণ মন্তব্যে আরও দুটি দ্যোতনা আমরা লক্ষ করি। নিতাইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'দেহ কঠিনপেশী, দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মতো'। কাকের উল্লেখ তার গাত্রবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত, আবার 'কাক,—কাকই সই' মন্তব্যে নিতাইয়ের হীন বংশধারার মালিন্য বাবু সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে বাস্তব। তারাশঙ্কর উল্লেখ করতে ভোলেননি—'নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না।'

নিতাইয়ের এই অভিমানাহত নীরবতা সামন্ত সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে জানে তাকে এই প্রতিকূল সমাজ পরিবেশের সঙ্গে লড়ই করে তবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। তার প্রতিপক্ষ মহাদেব পাল (নবশাখের অন্তর্গত) তাকে ব্যঙ্গ করে, তার নিম্নবর্গের দিকে ইঙ্গিত করে যখন গায়: 'আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা—গো' তখনও নিতাইয়ের নিরুপায় বিশ্বাস যে—'হুজুর—ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন/ সুবিচার হবে জানি নিশ্চয় তখন—জানি জানি!' অবশ্য নিতাইয়ের এই জানা নিতান্তই ভুল জানা। ভদ্র পঞ্চজন তথা হুজুরদের দরবারে তার সুবিচার পাওয়া কঠিন, হয়ত অসম্ভব। কারণ ভদ্র ব্রাহ্মণ্য সমাজের আরেকজন প্রতিনিধি বিপ্রপদ তো তাকে কবি না বলে প্রতিনিয়ত 'কপি কপিবর' বলেন। তার গাওনা শুনে কলিকাতা-প্রবাসী চাকুরে বাবুটি (যিনি

বলেছিলেন 'কাক, কাকই সই') বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'yes। এ রীতিমত একটা বিস্ময়। Son of Dom—অ্যাঁ—He is a poet!'

নজর করলে *কবি* উপন্যাসে এইভাবে আমাদের সামন্ত সমাজের বর্ণ বিভাজিত চেহারার দ্বান্দ্বিক বিন্যাস চোখে পড়বে। উচ্চবর্গের আয়োজনে শাক্ত মহাপীঠ অট্টহাস গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডার মাঘ মাসের পূজা উপলক্ষে বসে মেলা। সেই মেলারই অঙ্গ কবিগান—যাতে অংশগ্রহণকারী দল আর দর্শকরা প্রধানত নিম্নবর্ণের দরিদ্র, বিনোদনরিক্ত, গ্রামিক জনসমাজ। জমিদার, ব্রাহ্মণ ও প্রবাসী চাকুরে বাবুরা এখানে উত্তমর্ণ। অথচ তাঁদের কৃপা বা সমাদর ভিন্ন লোকসংস্কৃতির নিজস্ব বিকাশ অসম্ভব। দ্বন্দ্ব এখানেই এবং তারাশঙ্কর তা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এ উপন্যাসে জিতিয়ে দেন নিতাইকে তাঁর মানবিক সাহিত্যবোধের আদর্শে। পরিত্যক্ত অনাদৃত স্বজনভ্রষ্ট আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা উদ্ভিদের মতো লড়াই করে মাথা তোলে, পৌঁছোয় স্বীকৃতির স্বর্গে। ভদ্রপঞ্চজনের কাছে স্বীকৃতি নয়, কবিয়ালদের পরিমণ্ডলে — শ্রোতাদের কাছে। শিল্পের সফলতার মাপকাঠি কী? নিতাইয়ের স্বীকৃতি কোন্‌খানে কাম্য, তার আর্ট ফর্মটা কী, সেটাও ভাবতে হবে।

GRONTHO.COM

৩

এইখানে বুঝে নেওয়া জরুরি যে কবি-তরজা-পাঁচালি-পটুয়াদের পোটোগান এসব হল 'প্যারাম্বুলেটিং আর্ট' বা চলমান শিল্প। বাড়িতে বসে এর চর্চা চলে না—মিশতে হয় জনসমাজে, বুঝতে হয় তাদের নাড়ি। কী তারা চায়, কতটা পুরাণের লোকায়ন তাদের চেনাজানা তা না জানলে কেমন করে গান বাঁধা হবে? বহুদিন ধরে এইসব চলমান শিল্প আমাদের জনশিক্ষার বাহন, অন্তঃপুরের আলো। তারাশঙ্করের নিতাইও 'মনে মনে ভাবে, আর কী এমন রচনা করা যায়, যাহা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে

ফেরে।' জনবিনোদনের সেই রচনার জন্য সে বিদ্যাসুন্দর, দাশু রায়ের পাঁচালি, রামায়ণ-মহাভারত সংগ্রহ করে রেখেছে। বাৎসরিক মেলা মচ্ছবে, কত গ্রাম্য দেবদেবীর থানে, বাবুদের বাড়িতে কবি-পাঁচালির আসর বসে তার নানারকম শ্রোতাদের জন্য কবিয়ালকে তৈরি থাকতে হয়। আয়োজক বা উপলক্ষ যে-ই হোক, শ্রোতা সর্বত্রই সাধারণ গ্রাম্যসমাজ। কখনও কখনও তাদের নিম্নরুচির চাহিদায় আসরে খেউড়ও গাইতে হয়। শিল্পীসত্তার সেই অবনমন বা আপস একবাস্তব সত্য। একে 'কালচারাল অসিলেশন' বলেছেন কেউ কেউ, অর্থাৎ সংস্কৃতির দোলাচল। গানের আসরে বিনোদনের কথা মনে রেখেও ন্যায় নীতি ত্যাগ আদর্শের কথা আনতে হয়, উদাহরণ টানতে হয় পুরাণ থেকে। আবার দুই কবিয়ালের প্রতিযোগিতার মধ্যে ঝাঁজ চাই, এলেম চাই, চাই প্রত্যুত্তরদানের চকিত বুদ্ধিমত্তা। এর ব্যতিক্রম হলে, সাঁটে গান হলে দর্শক উঠে যাবে। উপন্যাসের শুরুতে মহাদেবের সঙ্গে নিতাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিষয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন:

> আপন দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার কবিগানের পাল্লা। সুতরাং পাল্লা বা প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোসমূলক—অত্যন্ত ঠাণ্ডা রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরনের। যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাহারা বলিল,— দূর দূর! ভিজে ভাতের মতো গান। এই শোনে! সাঁট করে পাল্লা হচ্ছে! চল বাড়ি যাই। দুই-চারজন আবার উঠিয়াও গেল।

কবি উপন্যাসে এমনতর খুচরো ব্যাপারে তারাশঙ্করের মনোযোগ তাঁর ব্যাপক অবলোকনের নির্ভুল পরিচয়। এই অশিক্ষিত শ্রোতাদের শ্রেণি পংক্তির মানুষ তিনি নন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে সচেতন যারা মিয়োনো গানের সঙ্গে ভিজে ভাতের মিল পায়। এই চলমান জীবনের বাউণ্ডুলে শিল্পী দলের বিষয়ে তিনি সম্যক জানেন যে—দলের নারীরা গানও করে আবার দেহব্যবসাও করে। যে—দলের পুরুষরা রক্ষক এবং ভক্ষক। দলের একজন লোক 'মহিষের মতো' ঝিমায়। 'সম্মুখে জ্বলিতেছে ধুনী।

অগ্নিকুণ্ডে মোটা মোটা কাঠের চ্যালা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লাল আগুনের শিখা জ্বলিতেছে। লোকটা ঝুমুর দলের পাহারাদার।' এই মানুষটাই আবার প্রৌঢ়া দলনেত্রীর প্রেমিক। বেহালার বাজনদার সারাদিন বেহালার পরিচর্যা করে আর মাঝে মাঝে অনেক রাতে তার যন্ত্র নিঃসঙ্গ বেদনায় ককিয়ে কাঁদে। আশ্চর্য জীবনচিত্র! তারাশঙ্করের সজীব বর্ণনায় ফুটে ওঠে এমন চলমান বেসাতির অন্যতর এক আলেখ্য। মেলায় বসনের ঘরগেরস্থি হল :

> কয়েকদিনের বসবাসের জন্য তৈরি খড়ের ঘর।...মেলায় সে কয়েকখানা ছবি কিনিয়াছিল, নূতন আমলের সাধারণ দেশীয় লঘুরুচি শিল্পীদের হাতের বিলাতী বর্ণ সমাবেশে আঁকা— জার্মানিতে ছাপা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ছবি। দুখানা উলঙ্গ মেমসাহেবের ছবি।

চলমান অনিশ্চিত অথচ আসক্ত এই বেঁচে বর্তে থাকার উপাখ্যানই *কবি*। তারাশঙ্কর ঝুমুর দলের সঙ্গে কখনও থাকেননি, কিন্তু এ তাঁর প্রত্যক্ষণের বাইরে নয়।

আমার সাহিত্য জীবন থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করলে তাঁর অভিজ্ঞতার সরেজমিন চরিত্র ধরা পড়বে। লিখেছেন :

> বাংলাদেশের, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের মেলায় ঘুরে ঘুরে নিম্নস্তরের দেহপণ্যাদের নিদারুণ দুর্দশা আমি দেখেছি।...তাদের মন দেহ সব অসাড়, দুঃখবোধ লজ্জাবোধ এ সবই নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পঙ্কিল জল আকণ্ঠ পান না করলে তখন আর এদের তৃষ্ণা নিবারণই হয় না। হতভাগিনীদের উপায় নেই, পথ নেই। মেলার পর মেলা ঘুরেছি, তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেখেছি। ঝুমুর দলের মেয়েরা এ থেকে কিছু স্বতন্ত্র।... ঝুমুর দেখে আসছি বাল্যবয়স থেকে।... ঝুমুর না হলে মেলা হয় না। কবিও হয় না। সে ওই দোয়ারকির জন্য। ঝুমুর দলের মেয়েরা কবিগানে দোয়ারকি করত এবং নাচত।...লুকিয়ে দেখতে গেলাম ঝুমুরের দল। মেলার প্রান্তে খড়ে ছাওয়া কুঁড়েতে তাদের বাসা। বাইরের গাছতলায় উনোন গড়ে

ভাত রান্না হচ্ছে। মেয়েরা সেজেগুজে বসে আছে। মুখে হাস্য, চোখে ইঙ্গিত, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে লাস্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বড় হলাম। ঝুমুর নাচ দেখলাম। ভদ্র আসরে দেখলাম। তখন সে খেমটা নাচের অনুকরণ। ভদ্রজনেরা চলে গেলে—সে আসরে, এবং যেখানে ভদ্রজনেরা যান না—সে আসরেও দেখলাম, তখন সে কুৎসিত কদর্য তাণ্ডব। একজন একটা দো-আনি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে, একটা মেয়ে নাচতে নাচতে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

এমন সজীব প্রত্যক্ষণ, বাল্য থেকে যৌবনের দিন পর্যন্ত দেখা গ্রাম্য বিনোদনের শিল্পী গোষ্ঠীর ক্ষণসংসার তারাশঙ্করকে প্রেরিত করেছিল নিতাই-বসন কাহিনি রচনায়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঠাকুরঝির মতো বসন চরিত্রের খানিকটা আদল আছে তাঁর দেখা এক ঝুমুর শিল্পীর সঙ্গে। তারাশঙ্কর একসময়ে সমাজসেবা করে বেড়াতেন গ্রামে গ্রামান্তরে, সঙ্গে থাকত কলেরার প্রতিষেধক ওষুধ। একজন ঝুমুর শিল্পীকে তিনি কলেরা থেকে বাঁচয়েছিলেন যথাসময়ে চিকিৎসা করে, তার নাম শুনেছিলেন বসন। তারও অভিভাবক ছিল একজন প্রৌঢ়া মাসী। নিশ্চিত মরণ থেকে বেঁচে উঠে মেয়েটি তাঁকে বলেছিল, 'আপনি না থাকলে মরে যেতাম বাবু, এরা হয়তো জ্যান্তেই ফেলে পালাত, আমাকে শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে নিত।'

সত্যি বড়ো বিচিত্র এই ভ্রাম্যমাণ ঝুমুরের দল। যূথবদ্ধ অথচ নির্মম, একসঙ্গে থেকেও মায়াহীন। *কবি* উপন্যাসে তারাশঙ্কর নির্বিকার ভাবে ঝুমুর দলের সত্য মূল্য নির্ধারণ করেছেন। যে-বসন এই ভ্রাম্যমাণ দলের মধ্যমণি—সে কোনো খদ্দেরের কাছে দেহদান করে পেয়েছিল যৌনরোগ। আগে থেকে ক্ষয় রোগ তার ছিলই। নিতাইয়ের মমতা ও ভালবাসায় যখন সে নতুনভাবে মদির জীবন পিপাসায় মত্ত হয়েছে তখন সহসা তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। লেখক বর্ণনা করেছেন তার সৎকার দৃশ্য। দেখিয়েছেন, নদীতীরে শ্মশানে বসনের সৎকারে নিতাইকে সাহায্য করল মেয়েরা। 'কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না' হঠাৎ

তাদের জাতিবর্ণ চেতনা জেগে উঠল। চিতায় আগুন লাগাবার আগের মুহূর্তে দলনেত্রী মাসি বসনের শরীর থেকে খুলে নিলেন আভরণ। তার বক্তব্য ছিল, 'এগুলো চিতেয় দিয়ে কি ফল হবে বল? বক্তব্য শেষ করিয়া হাসিয়া সে হাতের গহনাগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—এগুলি আবার আমার পাওনা বাবা।' কে বানালো এই নিয়ম, কীসের অধিকারে এমন পাওনা হল কে বলবে?

একদিক থেকে দেখলে *কবি* উপন্যাস ভ্রাম্যমাণ লোকজীবনের পাঁচালি বা ডক্যুমেন্টেসন। বীরভূম ও তার আশেপাশের ভ্রাম্য জনপদে ঝুমুর দলের যে-পথক্রমা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল সমাজের নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য সেই গোষ্ঠীর জীবনছন্দ আর রহস্যের জগৎ তাঁর রচনায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। তারাশঙ্কর ঠিকই বলেছেন:

> ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোনো শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনির উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে।

এই অদ্ভুত সংস্কৃতির বৃত্ত নিম্নস্তরের মেয়েদের এতটাই দীপিত করে যে তাদের বাচনে এসে যায় অলংকার আর ব্যঞ্জনা। যেমন নিতাইয়ের ব্যঙ্গ শুনে বসন জবাব দেয়, 'উনোন ঝাড়া কালো কয়লা—আগুন তাতে দিপি-দিপি'। আর-একদিন ঝুমুরের আসরে নিতাইয়ের গাওনায় দলের সম্মান রক্ষা হলে বসন নিতাইকে বলে—'আমার মান রেখেছ তুমি, ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ'। বাচনের এমন পারিপাট্য বসনের *অর্জিত*।

অর্জন মানুষ কত ভাবে করে। সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে বাস করে, নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, ব্রত পার্বণে করে, বিশেষ করে অন্তঃপুরের নারীসমাজ অর্জন করে কত অদ্ভুত আচরণ ও সংস্কার, রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ। কিন্তু অন্তঃপুরিকা নয় যারা, পরিবার ভ্রষ্ট--পথেই যাদের সংসার, মেলা মচ্ছবে যারা ঝুমুর-খেউড় গায়, দেহব্যবসা করে অসংকোচে, তারা তিক্ততা ছাড়া আর কী অর্জন করতে

পারে? তারা বরং দেখতে পায় মানুষের লোভ-লালসা-রিরংসা, অন্ধকার জগতের কামনা-কল্মষ। কিন্তু তবু কোন্ রন্ধ্রপথে তারাও পেয়ে যায় আলো, উন্নত জীবনের দিশা। তারাও লক্ষ্মীপুজো করে। নিতাই অবাক হয়ে দেখে গতরাতের কামনার দূতীরা নতুন প্রভাতে পূজারিণী। তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন:

> আশ্চর্য! আজিকার প্রভাতের এই স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির রূপের সহিত গত রাত্রির স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির এতটুকু মিল নেই। সমস্ত স্থানটা গোবরমাটি দিয়া অতি পরিপাটি রূপে নিকাইয়া ফেলা হইয়াছে। গাছতলার একটি কলার পাতায় অনেকগুলি ফুল, মেয়েগুলি স্নান সারিয়া জলসিক্ত চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া শান্তভাবে বসিয়া আছে; সকলের পরনেই লালপাড় শাড়ি—একটি নিবিড় এবং গভীর শান্ত পবিত্রতার আভাস যেন সর্বত্র পরিস্ফুট।

গৃহলক্ষ্মী যারা হতে পারেনি, ঘটলক্ষ্মী যাদের নেই, ফসল ফলানো মাঠ নেই, নবান্ন নেই, লক্ষ্মীর অনুষঙ্গে নেই সোনার ধান আর কড়ির ঝাঁপি, তারাও লক্ষ্মীকে স্মরণ করে। বৃহস্পতিবার আর পূর্ণিমায় তাদের নাকি 'বারোমেসে লক্ষ্মীপুজো'। কোথায় এই পূজার উৎস? উৎস কি সেই ফেলে-আসা যাপিত গ্রামজীবনে? হতভাগিনী ঘরছুট্ মেয়েগুলি নিশ্চয়ই বহন করে চলেছে তাদের কবেকার গৃহবাসের পূত স্মৃতি, লক্ষ্মী আবাহনের সংস্কার—এও একরকম 'প্যারাম্বুলেটিং কালচার'। কেবল মাঝখানে আছে একটু রফা, সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যাবেলা পুজো, তারপরে ঝুমুরের আসর বসে একটু রাতে। কিন্তু পুজোর আয়োজনটুকু সুন্দর, সুষ্ঠু :

> উপবাস তাহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করিল। সন্ধ্যায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই নানা উপচার ও ফুল, ধূপ, দীপ নানা আয়োজনে তাহারা লক্ষ্মী পূজা করিল। পূজা শেষে প্রৌঢ়াকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিল।... ব্রতকথা শেষ হইল। হুলুধ্বনি দিয়া সকলে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল।

৪

কবি উপন্যাস আরেকবার নতুন করে পড়তে গিয়ে মনে হল, নিতাইয়ের জীবনের যে-সম্পন্ন উপাখ্যান তারাশঙ্কর লিখতে চেয়েছেন তার মূল কথা নিতাইয়ের জীবনবোধ আর তার সংলগ্ন কবিত্বের ক্রমোন্মেষ। এই উন্মেষ তো কেবল প্রেরণা নির্ভর নয়—যাপনের নানা বিভঙ্গে আর উল্‌টো বাঁকে নিতাইয়ের সৃজন প্রতিভা ঝলসে উঠেছে। তার গান সহজিয়া নয়। গানের মূলে সংঘাত আর আত্ম-আবিষ্কারের পর্ব-পর্বান্তর। লক্ষ করলে দেখা যায় নিতাই কবিয়ালের লক্ষ্য জনবিনোদনের সফল শিল্পী হওয়া, যার থেকে ততটা অর্থাগমের আশ্বাস নেই কিন্তু জনস্বীকৃতি, চাদর আর মেডেল পাওয়া যায়। সে জাতিগতভাবে নিম্নস্তরের মানুষ—ডোম সমাজভুক্ত। তার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তাবাবা ঠ্যাঙাড়ে আর মাতামহ ডাকাত। নিতাইয়ের লক্ষ্য কবিগানের ভেলায় চেপে পার হয়ে যাওয়া জাতিবৃত্তের কলুষভরা নদী। নিছক সৃষ্টির মৌলিকতায় তা হওয়া কঠিন, কারণ, তার পরিচিত গ্রামপরিধির শ্রোতারা তাকে চেনে, জানে তার জাতি পরিচয় আর পিতৃ-পিতামহের অপরাধ প্রবণতার কাহিনি। কবিয়ালের ক্রমোত্তরণ তাই দ্বিমুখী—একদিকে কবিত্বের উন্মেষে, আরেকদিকে জাতিস্মৃতি বিস্মরণের পথে। এরজন্যে নিতাইকে ছাড়তে হয় স্বগ্রাম—পরিচিত গুণগ্রাহী বায়েন রাজনকে, এমনকী তার গানের প্রথম প্রেরণাদায়িনী নারী ঠাকুরঝিকে। সে আঁকড়ে ধরে এক মুক্ত সচল দলকে যা তার বদ্ধ জীবনের বিপরীতধর্মী। সেই পরিক্রমণশীল দলের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময়ী লীলাসঙ্গিনী বসন, যে দ্বন্দ্বে-ছন্দে নিতাইকে এনে দেয় অনুভব উপলব্ধির নানামুখী প্রবণতায়। তাকে ছিন্ন করে, দীর্ণ করে, ভেঙে দেয় তার ভালমানুষীর লোভ। জীবনের কদর্য ব্যাদান, কামনার ক্রূর অস্তিত্ব, দেহবাসনার উদগ্র রূপ, আকণ্ঠ মদ্যপানের উন্মাদনা—সবই নিতাই জানতে পারে বা দেখতে পায় চলমান জীবনের পায়ে ঘুঙুর হয়ে। আরও দেখতে পায় রোগজর্জর ক্ষণিক বেঁচে থাকার করুণ আয়োজন। বুঝতে পারে না জীবন এত ছোট কেন?

জীবন যে এত ছোট তা নিতাই বোঝাতে চেয়েছে গানের ভিতর দিয়ে।

এ-তার ব্যক্তিগত গানের বাণী, তাই এর লক্ষ্য বিনোদন নয়, আত্মজিজ্ঞাসা। নিতাইয়ের কবিয়াল জীবনের এটাই সবচেয়ে বড় উত্তরণ—জনবিনোদনের পক্ষে থেকেও আত্মপ্রশ্নের আবিষ্কার। ঠাকুরঝি তাকে প্রথম প্রেরণা দিলেও, তার ব্যক্তিগত গানের অন্তর্বাণী আর আন্তরপ্রশ্ন জেগেছে বিকাশের প্রান্তে, বসনের সংসর্গে, তাপে, ভালবাসায়। ঠাকুরঝির প্রতি নিতাইয়ের ছিল মোহ আর আসক্তি, তাতে দেহের ভূমিকা ততটা ছিল না, কিন্তু বসন তার কাছে আকণ্ঠ দেহকামনার উগ্রতায় ধরা দিয়ে ভালবেসেছে। নিতাইয়ের যে-জীবনোপলব্ধি তাকে ব্যক্তিগত গান লিখিয়েছে তার মূলে আছে দেহকে পেরোনো শমতার বোধ। তাতে 'ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি' কোনো বাইরের নিশানা নেই, 'আয়না বসা চুড়ির' ঔজ্জ্বল্য নেই—আছে 'রাঙা বরণ শিমুল ফুলের' বাহার সর্বস্বতাকে ভেদ করা অনুভবের অন্তঃপুর।

এই অন্তঃপুর যেমন তার নিজের তেমনই বসনের মতো বাসনাময়ী নারীর ভালবাসায় গড়া। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তারাশঙ্কর গড়পড়তা লেখকদের মতো নিতাই-বসনের সম্পর্ককে কখনও ভাবসর্বস্ব বা রোমান্টিক করে দেখাননি। নটী জীবনের আকর্ষণ বসন ত্যাগ করেনি, বহু পুরুষ সংসর্গ তার ব্যসন, নিতাইয়ের সামনেই সে খদ্দের ধরে দেহদান করে, এ-বৃত্তির সেটাই যে রীতি। এর একটা কারণ, মাসিকে টাকা দিতে হবে আর-একটা কারণ, অভ্যাস। তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'এই পঙ্কিল জল আকণ্ঠ পান না করলে তখন আর এদের তৃষ্ণা নিবারণই হয় না'। প্রবৃত্তির এমন দৈনন্দিন অভ্যাসবৃত্তি তারাশঙ্কর নির্বিকারভাবে এঁকেছেন, তাতে বসন চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে অনেক। তাকে যৌন রোগগ্রস্ত করে লেখক মনে হয় নিতাইয়ের অভিজ্ঞতার পরিধি আর একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন।

লোকশিল্পীদের জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের জ্ঞান ভাসাভাসা ছিল না এবং *কবি* লিখবেন বলে ঝুমুরের দলের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেননি। বাল্যজীবন থেকে তিনি এদের দেখেছেন। তবে প্রথমে এমন জীবনকে দেখা তাঁর পক্ষে নিষেধ ছিল, তাই আড়াল-আবডাল থেকে দেখতেন, পরে, একেবারে তাদের মধ্যে ঢুকে—কেননা তাদের ব্যাধি নিরাময়ে

তাঁকে ত্রাতার ভূমিকা নিতে হয়েছিল। ব্যাধি বলতে কেবল পথ চলতি ছোটখাট কিছু নয়, যৌনরোগও। নটী জীবনের ক্ষণিক দেহবিলাস এদের যেমন অনিবার্য, তার থেকে পাওয়া যৌনব্যাধিও তেমনই ভবিতব্য। *কবি* উপন্যাসে বসনের এ-ব্যাধি হয়েছে এবং দলনেত্রী মাসি তার চিকিৎসা করে নিরাময় করেছে। জড়িবুটি ইত্যাদি উপাদানে নানা লোক-ঔষধের প্রয়োগে পথবেশ্যাদের যেমন গর্ভিনী হবার থেকে মুক্তি ঘটে, যৌন ব্যাধিরও সেইরকম লোক-চিকিৎসা আছে এবং তা বহুদিন ধরে গোপনভাবে চলেছে—এও একরকম চলমান পদ্ধতি—দলনেত্রীর কাছ থেকে পরের দলনেত্রী শিখে নেয় মুখে মুখে।

নিতাই-বসনের ঝুমুরের দল গান গাইতে গাইতে পার হয়ে যায় নানা জনপদ, তারপরে একদিন বসন এসে দাঁড়ায় মাসির কাছে—তার যৌনরোগ হয়েছে। মাসি বলল, 'তার জন্যে ভয় কি? আজই তৈরি করে দেব। তিন দিনে ভাল হয়ে যাবে, মাছটা খাস না।' নির্মলা বলল, 'চুল বাঁধা রাখতে নাই। খুলে দি আয়।' একমাস পরে ব্যাধি নিরাময় হলে মাসি নির্দেশ দেয়, 'বসন, বেশ ভাল করে ত্যালে হলুদে মেখে চান কর আজ।...রোগের গন্ধ মরবে, অঙ্গের কালচিটে খসখসে বদছিরি যাবে, শরীরে আরাম পাবি।' এমন গুপ্ত রোগ, তার প্রতিকার ব্যবস্থা এবং পালনীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিস্ময়কর নয় কি? রোগগ্রস্তা বসনের যৌনজীবন ও ব্যাধি সম্পর্কে তারাশঙ্কর কত সহজে লিখেছেন, 'ইহাদের জীবনে কিন্তু এই ব্যাধি অনিবার্য। শুধু অনিবার্যই নয়, এ ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়াই সমস্ত জীবনটা কাটাইতে হয় ইহাদের। এই জর্জরতার বিষই মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে।'

নিতাইয়ের অস্তিত্ব ও কাব্যরচনার মায়া জগতে নারী শরীরের এমন বিড়ম্বিত অসহায়তার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না, কিন্তু এই পরিবেশ পরিস্থিতি সে সাষ্টাঙ্গে গ্রহণ করেছিল। তাই রোগমুক্তি ঘটলে বসনের 'রোগ-ক্লেদ-ভরা বিছানা-কাপড়—সমস্ত ক্ষারে সিদ্দ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল।' অথচ যার বস্ত্র ও শয্যা সে কেচে পরিষ্কার করল, লেখকের ভাষায় 'তাহাদের জীবনে প্রেম শরতের মেঘ, আসে,

চলিয়া যায়'। নিতাই এমনতর বিপ্রতীপ পরিবেশেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে তার প্রেমিক স্বভাব। কারণ সে কবি, স্রষ্টা—প্রবাহিত মানবজীবনকে দেখে দেখেই তবে তার রচনার সিদ্ধি। সেইজন্য ঝুমুরদলের সম্মান সে রক্ষা করে সময়োচিত এমনকি অপছন্দের হলেও আসরোচিত রুচিহীন গান লিখে। ঝুমুর শিল্পী বসন তার নৃত্য-সঙ্গিনী এবং আংশিক জীবনসঙ্গিনী হলেও তার কাছ থেকেই আত্মদর্শন লাভ করে সে, তাই তার ব্যাধিজর্জর কোনোকিছুকে ঘৃণা বা পরিত্যাগ করতে পারে না। ঝুমুরদলের অন্য মেয়েরা ললিতা নির্মলারা তার আত্মজন হয়ে ওঠে। তাদের ক্ষণবিলাসের ধাবন্ত দিনগুলি রাতগুলির মধ্যে নিতাই জেগে থাকে শুদ্ধতার বোধ নিয়ে—তার মানবসত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না, কবিসত্তা পায় নতুন প্রাণ-বেগ। ঝুমুর দলের কোকিল হয়ে নিতাই গান গায়।। মেয়েদের লক্ষ্মীপূজার আন্তরিকতা তাকে এতটাই ছুঁয়ে যায় যে সে লক্ষ্মীর পাঁচালি বানায়—

নমো নমো লক্ষ্মীদেবী—নমো নারায়ণী
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।

তার কবিত্বের এও একরকম লোকায়ন। পাঁচালি তরজার বৃত্ত ছাড়িয়ে দলের অভ্যন্তরীণ উৎসে এই কবিত্বের প্রসারণ।

৫

বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর সবচেয়ে দেশজ বললে আশা করি বিতর্ক হবে না। এই দেশীয়তাকে লুকিয়ে রাখতেন না তিনি এবং কলকাতায় দীর্ঘকাল বাস করেও কখনও স্বগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হননি। তাঁর কোনো নাগরিকতার ভান ছিল না। নিজের কৌলিক পরিচয় ফুটে উঠত কাঁধের পৈতে আর গলায় ঝোলানো রুদ্রাক্ষের মালায়। সকলের সামনে খালি গা-য় আসতে তাঁর কোনো লজ্জা বা সংকোচ দেখিনি। তাঁর উপন্যাসও এমনি অসংকোচ উদ্‌ঘাটনে স্পষ্টরেখ। নিজের

গ্রাম্য সংস্কৃতি আর রাঢ়ের গুণগাথার কথা বলতে তিনি অকুণ্ঠ ছিলেন। যে-জনপদকে তিনি নিজের কররেখার মতো ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন তাঁর সম্পর্কে আরও জানতে চাইতেন। *কবি* উপন্যাসে যে-ঝুমুরদলকে তিনি ব্যবহার করেছেন নিতাইয়ের অভিজ্ঞতা আর কবিসত্তার ব্যাপ্তি-বৈপরীত্যের কারণে, প্রথম যখন *কবি* গল্পটি লেখেন তখন তা আনেননি। বসন চরিত্র এবং তার সম্পর্কিত উপাখ্যানটিই ছিল না এ কথা আগে বলেছি। কিন্তু গল্পের উপন্যাসরূপ দিতে গিয়ে ঝুমুরদলের উৎস ও ইতিহাস তিনি জেনে নিয়েছিলেন নিজের চেষ্টায় ও পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তারাশঙ্কর লিখছেন :

> ঝুমুর দল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে এরা বংশানুক্রমিক ভাবে বাস করছে। ঝুমুর দলের মেয়ে ঝুমুর দলে নাচে—তার মেয়ে, তার মেয়ে নেচে আসছে, গেয়ে আসছে। এরা পদাবলী জানে, খেউড় জানে। আবার আধুনিক খেমটা-টপ্পাও জানে। মল্লারপুরে ঝুমুর দলের একটা পাড়াই আছে। আজকাল হয়ত লুপ্ত হয়ে গেল বা গেছে। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশি, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনীয়ার দল ছোটবড়-ভালোমন্দ নির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন করে দেশে ফিরত। এই ছোট-বড়দের মধ্যে ছোটরা শেষে প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদি-রসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়। তারপর হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্ম বাদ দিয়ে নিছক নাচ গানের দলে পরিণত হল। ফোঁটা তিলক মালা ফেলে কেশবিন্যাস হল স্বৈরিণীর উপযোগী, গায়ে উঠল পিতলের গহনা চুড়ি বালা বাউটি বাজুবন্ধ চিকহার, কানে কান, কপালে ঝাপটা। পায়ের নূপুর ঘুচে উঠল ঘুঙুর। তবু আজও এরা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ

মহাপ্রভুর বন্দনা না করে গান শুরু করে না।

এই সমস্ত কিছু জড়িয়ে আমার মনের মধ্যে এরা একটি অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাই নিতাইয়ের কবিয়ালির সঙ্গে বসনের কথা জুড়ে দিয়েছিলাম।

প্রথম লেখা *কবি* গল্পে গ্রাম্য এক ডোমের ছেলে নিতাইয়ের কবি-হয়ে-ওঠার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছিল এবং সেইসঙ্গে ছিল ঠাকুরঝির চরিত্র। কিন্তু সেই বীজগল্পটি যখন উপন্যাসের বিস্তারে পত্রপুষ্পে ডালপালায় গাছের মতো আকার পেয়ে গেল তখন বসন ও ঝুমুরের দল তাদের বিচিত্র সব রিচ্যুয়াল আর যাপন প্রণালী নিয়ে রচনাটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল। ঐ যে তারাশঙ্কর বলেছেন, 'এরা পদাবলী জানে, খেউড় জানে। আবার আধুনিক খ্যামটা-টপ্পাও জানে', এ কথাকটি মনে রাখলে বোঝা যাবে বিনোদনের টানে উচ্চাবচ দুদিকেই তাদের গতায়াত। ঝুমুরদলে আসার আগে নিতাইয়ের দৈনন্দিনতা আর বিশ্বাসের জগৎ ছিল সরলরেখার মতো। সেখানে ঠাকুরঝির সঙ্গে বড়জোর ছিল মান-অভিমানের দোলাচল, যা থেকে অনুরাগের গান 'ও আমার মনের মানুষ গো' অবধি লেখা যেত। নিতাইয়ের রচনা ঐ পর্যায়ে কখনও 'বুড়ি দূতী নেড়ী কুত্তি জুতি ছাড়া নয় সায়েস্তা' এমন বাচনের বিদ্রূপে বা 'বুড়ি খানকী নেড়ী কুটনী মরে নাই'-য়ের রুচিহীনতায় পৌঁছোত না, যা ঝুমুর দলের সংসর্গে পৌঁছেছে।

কবি উপন্যাসের সফলতা দ্বিমাত্রিক। নিম্নসমাজের একজন আপাত অশিক্ষিত মানুষ তার কৌলিক কালিমা ও পারিপার্শ্বিকের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে সচল সমাজের অংশ করে তোলে এবং কবিয়াল রূপে তার রচনা অনুভব-সর্বস্বতাকে ছাপিয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। প্রথম পর্বে তার প্রেরণা ঠাকুরঝি। দ্বিতীয় পর্বে বসন আর ঝুমুরের দলের নিজস্ব নাটকীয়তা, যা প্রয়োজনে নিম্নরুচিরও পরিপোষক। *কবি*-র লোকায়ত-পাঠে এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভূতিভূষণ বা সমরেশ বসু যে-কাজটা পারেননি, তারাশঙ্কর সেটা পেরেছেন, অর্থাৎ উপন্যাসের প্রয়োজনে নিজে গান লিখেছেন এবং

সেই গান ভদ্রলোকশ্রেণির লিরিক না হয়ে লোক সমাজের শ্রোতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কাজটা কঠিন, যেহেতু গান-বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা বা প্রবণতার কোনো সংবাদ জানা যায়নি। তিনি নিজেই কবুল করেছেন, 'কবি'র গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়। ওগুলি সবই আমি রচনা করেছি। কি ভাবে করেছি বলতে পারি না।'

তিনি বলতে না পারলেও আমরা অনুমান করতে পারি। গান, বিশেষত বাঙালি পল্লিজীবনের গান এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকে হাটে-মাঠে-বাটে মেলায়-উৎসবে সর্বত্র যে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না, নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন ঢুকে যায়। কানের ভিতর দিয়ে মর্মে চলে আসে। গীতময় দেশের বাতাবরণে গানের উত্তরাধিকার সকলের পক্ষে স্বাভাবিক। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে যেটা আলাদাভাবে বাস্তব তা হল তাঁর রাঢ় জনপদের গীতবলয়ের নিজস্বতা। এই বিশেষ জনগোষ্ঠীতে লোকজীবন খুবই সমৃদ্ধ, তার নমুনা পাই বাউল ফকিরি গানে, কবি পাঁচালি তর্জায়, ঝুমুর গানে ও নাচে, পালাকীর্তন ও ঢপকীর্তনে, রায়বেঁশে নাচে, গাজন, বোলান ও পটচিত্রকরদের গানে। অলক্ষে এতরকম গানের উৎসার গ্রামের উচ্চ ও নিম্ন দুই বর্গকেই স্পর্শ করে। সেখানে গ্রামের জমিদার তথা ভূস্বামী শ্রেণির সঙ্গে একই আসরে বসে গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাট্য এবং গানের বিষয়গত রূপভেদ উপভোগ করে সাধারণ মানুষ। তারাশঙ্কর তার উপরে ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন ভ্রমণশীল, গ্রামসংস্কৃতির সমজদার ব্যক্তি, তাই লৌকিক গীতিরূপগুলির নানা বৈচিত্র্য তাঁর আলাদাভাবে জানা ছিল। ঝুমুরের শুদ্ধ আসর পাল্লাদারির ঝোঁকে কেমন করে রসবিকৃতির দিকে ঢলে পড়ে, বদলে যায় গীতবাণীর লব্জ ও তালের অতিকৃতি, নাচের অশালীনতা—সবই তাঁর স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা। এমনতর উন্নত লোকসমাজে মানুষের জীবন-ছন্দ আর জীবন-ভাবনা একসুরে বাঁধা থাকে, তা অভিব্যক্ত হয় চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তিতে, গানে ও নাচে। বীরভূমের মল্লারপুর যেমন ঝুমুরের দলের জন্য বিখ্যাত, ময়নাডাল গ্রামের গায়নসমাজ তেমনই ঐতিহ্যশালী পালাকীর্তনের জন্য সারা বাংলায় সমাদৃত। ঝুমুর ও পালাকীর্তন দুইই নাট্যধর্মী। *কবি* উপন্যাসের গানের

রূপরীতিও নাট্যধর্মী এবং তাতে কীর্তন ও ঝুমুরের প্রভাব বেশ প্রকটিত। কিন্তু উপন্যাসটির অন্তর্গত যে-গানগুলি বেশিরভাগ মানুষের মনকে টানে—যেমন 'কালো যদি মন্দ তবে', 'ভালবেসে এই বুঝেছি', 'ও আমার মনের মানুষ গো' এবং 'এই খেদ আমার মনে'—সেগুলি সবই ছোট আকারের লিরিক। তারাশঙ্কর কীভাবে কবি-র অন্তর্গত গানগুলি লিখেছিলেন তা বুঝতে পারেননি, অথচ তাঁর লেখা থেকে অন্তত একটা গান রচনার অন্তঃপুর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। *আমার সাহিত্য-জীবন* বইতে লিখেছেন :

> হঠাৎ মনে এসে গেল, 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে? গুনগুন করে গাইছি, যামিনীদা বেরিয়ে এলেন দরজা খুলে। গানটা তাঁর কানে গেছে। বললেন, কি, কি গাইছিলেন ভায়া?

বর্ণনা থেকে তো স্পষ্ট যে তারাশঙ্কর গাইতে পারতেন এবং তা বেশ জোরে, নইলে প্রতিবেশীর কানে যাবে কী করে? অবশ্য আজ আর জানার উপায় নেই সুরটা কেমন ছিল অর্থাৎ তার আদলটা কেমনতর।

গানের আলোচনায় সবচেয়ে জরুরি প্রসঙ্গ কিন্তু সেটা—অর্থাৎ তার গঠন আর সুরের ধাঁচ। তারাশঙ্কর তাঁর বেশ কটি উপন্যাসে গান ব্যবহার করেছেন অথচ তিনি গান জানতেন না। এই না-জানা বলতে বুঝব, গানের কলিবিভাগ, অর্থাৎ আস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ এই চতুরঙ্গ বিন্যাস মেনে গান লেখার মুন্সিয়ানা তাঁব পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তবে তাঁর লেখা গানে সুর দিয়েছেন অন্যজন। কাজেই সমস্যাটা ছিল তাঁদের। যেমন ধরা যাক *কবি* চলচ্চিত্রের সুরকাররূপে অনিল বাগচী বেশ সফল হয়েছিলেন। তাঁর সুর করা গানে রবীন মজুমদারের কণ্ঠবাদন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। অনিল বাগচীর সংগীতজ্ঞান ছিল পাকা, তাই কবিয়ালের গানের সওয়াল-জবাব কিংবা ঝুমুর সুরের তরল ভঙ্গির ধরন কবি-গানে প্রয়োগ করেছিলেন নিপুণভাবে। তরল সুরে চটুল তাল, সঙ্গে ঢোল কাঁসি সঙ্গত, গানগুলি জমে গিয়েছিল। এ জাতীয় সুরের ধাঁচা মোটামুটি গানের মানুষরা সবাই জানেন তাই অসুবিধা হয়নি। *রাইকমল চলচ্চিত্রে* সুরকার পঙ্কজ মল্লিক লৌকিক কীর্তনের পথে হাঁটেননি,

মনোহরসাহী কীর্তনের আঙ্গিকের উপর ভরসা করেছিলেন এবং গানগুলি উৎরে দিয়েছিলেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনবদ্য গায়নে। *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* ও *নাগিনীকন্যার কাহিনী* ছবিতেও গান ছিল, তবে সেগুলি *রাইকমল* বা *কবি*-র গানের মতো জনপ্রিয় হয়নি। আসলে *কবি*-র মূল শক্তিই হল তার গান এবং নানা ধাঁচের গান। অথচ খেয়াল করলে দেখা যাবে কবি-র চলচ্চিত্ররূপ বা নাট্যরূপে উপন্যাসে ব্যবহৃত সব কটি গান প্রয়োগ করা হয়নি। কেন হয়নি? সেকি পরিচালকের নির্দেশে না সুরকারের দুর্বলতায়? গানের খর্বতা বিষয়ে তারাশঙ্করের আপত্তির কথা যখন জানা নেই আমাদের, কাজেই এ প্রশ্নের জবাব মিলবে না।

কিন্তু একটা অস্বস্তির কথা আমরা তুলতে পারি। অনিল বাগচী সুরারোপের ক্ষেত্রে নিতাইয়ের রচিত ছোট ছোট লিরিকাল গানগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন। 'এই খেদ আমার মনে', 'ভালবেসে এই বুঝেছি' কিংবা 'ও আমার মনের মানুষ গো' এবং 'কালো যদি মন্দ তবে' গানের আঙ্গিকে ঠিক রচিত নয়—সুরারোপে তাই বড়জোর আস্থায়ী আর অন্তরা এই দুই তুক মান্য করা হয়েছে। সুর রচনায় তালের ক্ষেত্রে ঢোলের ব্যবহারের কথা মনে রাখতে হয়েছে। কাশীতে গাওয়া রামপ্রসাদী ধাঁচের গান, বারোমাস্যা আর ঝুমুর দলের পাঁচালি *কবি*-র সবচেয়ে লোকায়ত অংশ—সেগুলি বাদ পড়েছে। তার কারণও স্পষ্ট। *কবি*-র চলচ্চিত্রায়নে জোর দেওয়া হয়েছিল দুটি ভিন্নধর্মী প্রেম পর্যায়ের প্রতি—ঠাকুরঝি আর বসনের চরিত্রায়নের দিকে নজর রেখে *কবি*-র একটি নাগরিক ভাষ্য যেন তার চলচ্চিত্র রূপ। তিন তিনটি প্রধান চরিত্রের ত্রিকোণ কাহিনি তাতে প্রধান হয়ে উঠেছে। অথচ লোকায়ত পর্বে ধরা পড়ে *কবি* উপন্যাসের অন্য আরেকটি রূপ। হয়তো রসোপভোগের ক্ষেত্রে সেটাই তার পরম রূপ নয়, গান বাদ দিলেও এ উপন্যাসের একটি রসরূপ বজায় থাকে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে এসে আমরা কী দেখি? ঠাকুরঝি আর বসনের বিয়োগে দিশাহীন নিতাই রাজনকে বলে চণ্ডীতলায় যাবে সে। কেন? কারণ চণ্ডী মা-কে প্রণাম করবে সে গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে। উপন্যাসের শেষ বাক্যটি এবারে লক্ষ করতে হবে। তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'তাহার সর্বাঙ্গ যেন

এখানকার ধূলোমাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধাইবে—মাগো—জীবন এত ছোট কেনে?'

নিশ্চয়ই নিতাইয়ের কবিয়ালের জীবন থেমে থাকবে না। দুটি মৃত্যুর আঘাতে আহত আর দীর্ঘ প্রবাসের পরেও আবার সে ফিরে এসেছে তার গ্রামের লোকায়তে। এবার তার নব উজ্জীবনের শুরু—সে যে কবি।

কালকূট : লোকে লোকায়তে

কালকূট নামের আড়ালে সমরেশ বসু যে রচনাগুলি লিখেছেন সেগুলিতে তাঁর ব্যক্তি পরিচয় সচেতনভাবে প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেয়েছেন। কাজেই কালকূটের রচনার মূল স্বভাবকে বোঝবার জন্য সমরেশের জীবন-ঘটনা যে সর্বদা জানতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। আমরা বর্তমান নিবন্ধে কালকূট বলতে তাই এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন স্বয়ম্ভর কথাসাহিত্যিককেই বুঝে নেব। এই বুঝে নেবার ক্ষেত্রে দু'টি দিক আমাদের লক্ষ রাখতে হবে—এক: কালকূটের রচনার বিষয়, দুই: কালকূটের রচনার শৈলি। যে কেউ সামান্য আয়াসে কালকূটের রচনা পড়লে বুঝবেন যে তাঁর বিষয়বস্তু হল প্রধানত ভ্রমণজনিত জীবনকে দেখা এবং দেখানো। এখানে ভ্রামণিক শুধু কালকূট নন, যাদের কথা তাঁর রচনায় আসছে তাদের জীবনেরও কোনো স্থির বিন্দু নেই। এক অর্থে তাঁরাও ভ্রামণিক। অর্থাৎ জীবনের কোনো ধ্রুব প্রত্যয় ও স্থির মতাদর্শ তাদের জীবনকে স্থায়িত্ব দেয়নি। তাঁরাও ঘুরছেন কালকূটও ঘুরছেন। কিন্তু দুজনের অবস্থান আলাদা, কারণ দুজনের অন্বেষণই বুঝি আলাদা। লক্ষ করলে আরও চোখে পড়ে যে কালকূটের ভ্রমণের অন্যান্য অংশ হল নদী বা পথ ও মেলা যা চিরচলমান, যা লক্ষ্যের অভিমুখী, যা অন্বেষায় দীর্ণ বা মানবসঙ্গমের দ্বৈততায় বিচিত্র। কালকূটের সমগ্র সাহিত্য পরিমণ্ডলে চলমান মানুষ, ধূলিময় পথ এবং স্রোতোবহা নদী একাকার হয়ে গেছে। এইসব গতিরাগের বাহনে চড়ে তিনি চলেন মানুষের মেলায়। সেক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র দিশারি হল প্রেম। তাঁর সমগ্র রচনাবলির মধ্যে একটি বাউল গান বারে বারে ধ্বনিত হয়—'যে জন প্রেমের ভাব জানেনা তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।' এক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময়কেই

কালকূটের জীবনবিশ্বাসের চাবিকাঠি বলা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালকূটের জগৎ শুধু ভাবময় থাকেনা, তা হয়ে ওঠে রূপময় এবং সংগীত মুখরিত। এক্ষেত্রে রূপকে তিনি ব্যবহার করেন অরূপকে বোঝার জন্য এবং সংগীতকে ব্যবহার করেন সেই অরূপের বাণীরূপে। কালকূটের রচনাবলির অন্তঃসার বহু সময়েই ধরা আছে নানারকমের লোকায়ত গানে। তা কখনও শ্যামাসংগীতে, কখনও কীর্তন এবং প্রধানত বাউল ও মারফতি গানে। কালকূটকে বুঝতে গেলে এই লোকায়ত গানগুলি অনেক দূর পর্যন্ত পথপ্রদর্শন করে।

এই প্রসঙ্গে কালকূটের রচনাশৈলির মূলধাঁচটি বুঝে নেওয়া দরকার। তা স্পষ্টত অনেকটাই আত্ম-সংলাপধর্মী, অব্যয়বহুল, ভারহীন। সহজ-সরল-আয়ত বিস্তারধর্মী তাঁর গদ্য, কিছুটা বা শিথিল। কালকূটের রচনাশৈলি অনুধাবন করলে বোঝা যায় কোথাও যেমন তাঁর কোনো তাড়া নেই, তেমনই সংযমের যতি নেই, বর্ণনার ক্ষিপ্রতা নেই। অনেকটা যেন তাতে ফুটে উঠেছে অ-ত্বর পায়ে চলার ছন্দ, শান্ত নদীস্রোতের সুষমা কিংবা নির্জন অন্বেষী মানুষের ধ্যান। আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার এবং আঞ্চলিক বাক্‌রীতির বহু ফলিত নমুনা কালকূটের রচনায় পাওয়া যাবে। বিশেষভাবে লভ্য হল বীরভূম বর্ধমান অঞ্চলের ডায়ালেক্ট। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে সেই ডায়ালেক্টের সঙ্গে লোকায়ত গানের বাণী অনেকক্ষেত্রে মেলেনি। তার কারণ হিসাবে আমরা অনুমান করতে পারি কালকূট লোকায়ত মানুষকে, তার জীবনকে ও তার বাক্-বিধিকে যত সহজে পেয়েছেন তাঁদের মুখের গানকে হয়তো ততটা সহজে একই উৎস থেকে পাননি। গানগুলি যেন অনেকটা আরোপিত। এই অসঙ্গতি *কোথায় পাব তারে* উপন্যাসে খুব প্রকট।

কালকূটের রচনায় লোকায়ত গানের প্রয়োগ ভাবের দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি কোনো কোনো চরিত্র ও লৌকিক ধর্মের তত্ত্বকে পরিস্ফুট করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ সবিস্তার আলোচনার সূত্রে সমরেশ বসু ও কালকূটের সাহিত্যের মূল ভিত্তিতে যে-একটি লোকায়তিক জীবন-পরিবেশের ও লোকায়তিকে

বিশ্বাসের জগৎ বারেবারে ফিরে আসে এই কথাটা আগে বোঝা দরকার। ফিরে যে আসে তার কারণ নিম্নবর্গের মানুষজনের সমাজবৃত্তে তাঁর চিরকালই স্বচ্ছন্দ চলাচল ছিল। যাকে বলে এলিটিস্ট কালচার তার মধ্যে তিনি কোনো কালেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না এবং তাঁর সাহিত্য-প্রত্যয়ের মূলে এলিটদের তুলে ধরার প্রবণতা আমরা বিশেষ দেখিনা। এর একটা কারণ হতে পারে যে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিশ্বাস ও ভাবনাগুলির সমর্থন অনেক-ক্ষেত্রেই খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যেই পেয়েছেন। আর একটি কারণ এই নিম্নতর জীবন-পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকা মানুষগুলির মধ্যে তিনি বারেবারে দেখতে পেয়েছেন স্বাভাবিক জীবন ও যৌনতার সহজ স্বীকৃতি। তাদের সমাজে প্রচলিত লোক কাহিনি ও লৌকিক গানের জগৎ তাঁকে টেনেছে।

আসলে সমরেশ বসুর জীবন আশ্চর্য এক দ্বৈততার মধ্যে পাক খেয়েছে। তাঁর শৈশব কৈশোর পরিবেশের পূর্ববঙ্গীয় জীবনে যেমন ছিল নানা বহতা নদীর ধারা আবার তেমনই তাঁর যৌবন থেকে পূর্ণতার দিনগুলিতে নৈহাটির বসতের পাশে ছিল বহতা গঙ্গা নদী। তাই নদী তাঁর প্রিয় বিষয় এবং নদীর গতি স্রোতের মতোই তাঁর জীবন ছিল উচ্ছ্রিত নানা বিভঙ্গে দোলায়িত, স্রোতাবর্তে উত্তাল এবং নতুন নতুন বাঁকে যাওয়ার কৌতূহলে দুর্বার। এরই বিপরীত দিকে আমরা দেখি তাঁর বসতের আর একপাশে ছিল হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অচলতা নিয়ে ভাটপাড়ায় পণ্ডিত সমাজ, যেখানে ন্যায়নীতি ও শাস্ত্রের অতিরেক তিনি লক্ষ করেছিলেন। তাঁর বসতের খুব কাছেই গঙ্গার তীরে তীরে পাণ্ডুয়া-ত্রিবেণী-কালনায় তিনি বহুবার দেখেছেন শাক্ত, বৈষ্ণব ও সহজিয়াদের পরিমণ্ডল। আর একদিকে হালিশহরে যেমন ছিল শাক্ত সাধকের ভিটেমাটি তার আর একটু উজানে তেমনি তিনি পেয়েছিলেন ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদের সত্যধর্ম, যার মূল কথা হল মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সহাবস্থান।

কালকূটের জীবন পরিবেশের এই বিচিত্র অবস্থান তাঁর অভিজ্ঞতাকে যেমন জারিত করেছে তেমনি জীবনবোধে এনেছে এক ধরনের শমতা। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল অস্থিতির ধর্ম। কোনো এক জায়গায় বেশিদিন

তিনি টিকতে পারতেন না। কাঁধে একটি ঝোলা নিয়ে যৎ-সামান্য পুঁজি সম্বল করে তিনি বেরিয়ে পড়তেন যদৃচ্ছ। কিন্তু তাঁর লক্ষ ছিল সুনির্দিষ্ট। সেই লক্ষ হল মানুষের মধ্যে মানুষকে খোঁজা। *খুঁজে ফিরি সেই মানুষে* বা *কোথায় পাবো তারে* এইসব গ্রন্থনাম আমাদের স্পষ্টই ইঙ্গিত করে যে কালকূটের মূল লক্ষ্য হল 'এই মানুষের' মধ্যে 'সেই মানুষকে' খোঁজা। এই কথাগুলি লোকায়তিক জগতে সাধকদের কণ্ঠে অনেকবার আমরা শুনেছি, যদিও সবাই তার তাৎপর্য তেমন করে হয়তো বুঝিনি। কথাগুলি তেমন করে বোঝাবার দায় অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন পর্যন্ত কেউই অবশ্য নেননি। কালকূটের কয়েকটি লেখায় আমরা এই কথাগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা যে পাই শুধু তাই নয়, এই কথাগুলির মর্ম যাঁদের জীবনকে ঘিরে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে তাঁদের বিচিত্র জীবনসাধনা ও বিশ্বাসের গভীর শিকড়কে আমরা দেখতে পাই। সে শিকড় থেকে যারা মানে মানুষের মধ্যে শুধু দুটোই জাতি—পুরুষ ও নারী, যারা নর-নারীর গভীরতম সম্পর্কের উৎসে বিবাহের বন্ধনকে অনেকে মানেনা, যাদের জীবনের যাপনগত সাবলীলতায় কোনো শাস্ত্রের বা মন্ত্রের প্রতিবন্ধতা নেই, সেই মানুষগুলিকেই যে লেখক কেবল তুলে ধরেছেন তা নয়। বরং তাদের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন এবং তাঁদের জীবনবিশ্বাসকে জয়ী করে দিয়েছেন আমাদের সামনে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কথা, যেখানে নিম্নবর্গের মানুষ তাদের চরিত্র ও জীবন-অভ্যাস নিয়ে আমাদের প্রথম চমকে দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম অন্ত্যজ একজন মানুষকে কবিগানের গায়ক হিসাবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। নিছক জীবন-জীবিকার দৈনন্দিন গ্লানির ঊর্ধ্বে যে নিতাই কবিয়াল গান গেয়ে উঠতে পারে। তারাশঙ্করের বেশ কিছু লোকায়ত জীবনভিত্তিক উপন্যাসেও গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অবশ্য সেসব গান বিশেষ লৌকিক ধর্ম বা বিশ্বাসের জগৎকে বোঝানোর জন্য রচিত হয়নি। তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব সৃজনস্বভাবে কয়েকটি চরিত্রের মুখে চমৎকার কয়েকটি লোকায়ত ধাঁচের গান বানিয়েছেন। তার মধ্যে একটি

গান ছিল 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে'? প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে এই গানটি ছিল সমরেশের খুবই প্রিয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নৈহাটির অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত আলাপচারিতে আমাকে জানিয়েছেন যে সমরেশ ছিলেন অতি সুকণ্ঠ গায়ক এবং 'কবি' চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গানটি তিনি নিজের দেওয়া সুরেই গাইতেন। তাঁর কাছ থেকে আরও জানা যায় যে কালকূট বিভিন্ন রচনায় যেসব লোকায়ত গান ব্যবহার করেছেন বহুক্ষেত্রে তার প্রথম একটি-দুটি লোক প্রসিদ্ধ পংক্তিই তাঁর জানা ছিল। গানের বাকি অংশটি কালকূট নিজেই নির্মাণ করেছেন। সমরেশের প্রীতিভাজন বন্ধু সত্যজিৎ চৌধুরী আমাকে তথ্য হিসাবে জানিয়েছেন যে নৈহাটির বন্ধুমহলে সমরেশ টেবিল বাজিয়ে বেশ কিছু লোকসংগীত গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন তার মধ্যে বেশি যে-গানটি গাইতেন তা হল—'হায় কালা বিড়াল কে আনিল পাড়াতে, ধইরা দে না ললিতে।' এইসব তথ্য জড়ো করলে বোঝা যায় কালকূটের জীবনে লৌকিক গান ও তাঁর সুরের মরমি জগৎ এক গভীর আসন পেয়েছিল। সেইজন্য কালকূট নামের আড়ালে লেখা তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা *অমৃতকুম্ভের সন্ধানে* উপন্যাসের একেবারে সূচনাতেই আমরা পেয়ে যাই একজন প্রতিবন্ধী লৌকিক গায়ককে। এই 'মা-খেগো বলরাম' কালকূটের উপন্যাসে প্রথম লোকায়ত চরিত্র যে কথায় কথায় গান গেয়ে ওঠে। সন্দেহ হয় বলরামের লোকায়ত স্বভাবের গানগুলি কালকূটেরই নিজের রচনা। সে কালকূটকে বলে—

> বাবু পা দুইখানা নাই কিন্তুন্ মানুষ তো। তাই মানুষ ছাড়া থাইকতে পারিনা। . . .বাবু বৈরাগ্য এইলে বৈরাগি হয়। আসলে আমরা সব্বাই বাউল।

১৯৫৪ সালে কালকূট *অমৃতকুম্ভের সন্ধানে* লেখেন তখন জানা ছিলনা যে প্রথম থেকেই তাঁর কালকূট রচনাসম্ভারে বরাবরের জন্য যুক্ত হয়ে গেল লৌকিক গানের সংযোগ এবং লোকায়ত জীবনের মাত্রা।

কালকূটের সাহিত্য সাধনায় লোকায়তিক মাত্রাটিকে বোঝানোর জন্য আমরা সমরেশ বসুর প্রসঙ্গ আনতে চাইনা। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে না

এনেও উপায় নেই। যেমন আমাদের মনে পড়ে যে তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস *নয়নপুরের মাটি*-র [যা লেখা হয়েছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস উত্তরঙ্গ-র (১৩৫৮ ব.) অনেক আগে] বিষয়বস্তু ছিল নদীপারের এক মৃৎশিল্পীর জীবনকাহিনি। মালাপাড়ার লোকায়ত গ্রামের মহিম নামে একটি যুবক মাটি ছেনে জীবনের তাপে কেমন করে মূর্তি গড়ে উপন্যাসটি তারই কাহিনি। সমরেশের আরও অনেক গল্প-উপন্যাসের লোকায়ত জীবনের অভিজ্ঞতা আপন স্পর্শ রেখে যায়। তবু বিশেষভাবে মনে পড়ে তাঁর একটি উপন্যাস *ছিন্নবাধা*-র কথা, যেখানে অভয় নামে একটি নিম্নবর্গের যুবক আপন স্বভাবে গান বাঁধে এবং কবিদারি করে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে থাকে যে *ছিন্নবাধা* উপন্যাসে অভয়ের কণ্ঠে যতগুলি গান আছে তার সবই সমরেশ বসুর রচনা।

আমাদের প্রস্তুত নিবন্ধের লক্ষ্য হল, কালকূটের রচনাসম্ভারের গভীরে যেসব লোকায়তিক পর্যবেক্ষণ সেগুলিকে সনাক্ত করা। বিশেষভাবে আমাদের বোঝা দরকার যে কালকূট তাঁর বেশ কিছু রচনায় কেন এনেছিলেন নানা ধর্ম ও উপধর্মের প্রসঙ্গ। কেন এবং কতটা সুমিতভাবে তিনি লৌকিক গানগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন। বিভিন্ন লোকায়ত ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের তিনি কতটা সত্যনিষ্ঠভাবে আমাদের সামনে হাজির করেছেন, কতটাই বা তাতে কল্পনার রঙ লাগিয়েছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়তো সব ক্ষেত্রে লেখকের অনুকূলে যাবে না, কারণ, ইংরিজিতে যাকে বলে 'distortion' তা কালকূটের এ জাতীয় রচনায় অনেকক্ষেত্রে আমরা খুঁজে পাব। তাতে অবশ্য লেখকের সৃজনী প্রতিভার মহিমা কিছুমাত্র খর্ব হয় না এবং তা দেখানোও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বরং এই চিরপদাতিক, এই অদম্য লেখকের গভীর সংবেদন ও বিপুল গ্রহিষ্ণুতার কথা ভেবে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ই মানব।

কালকূট রচনাসম্ভারের মধ্যে বিশেষভাবে যে বইগুলি কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় বা লোকায়ত জীবনবিশ্বাস ঘিরে গড়ে উঠেছে সেগুলির নাম হল *মুক্ত বেণীর উজানে* (১৯৮০), *চল মন রূপনগরে* (১৯৮১), *অমাস্যায় চাঁদের উদয়* (১৯৭৪), *কোথায় সে জন আছে*

(১৯৮২) এবং বিশেষত *কোথায় পাবো তারে* (১৯৬৮)। এর মধ্যে কোথায় পাবো তারে সম্ভবত কালকূটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় ও বাণিজ্যসফল রচনা। কাজেই এই বইটি সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে গ্রথিত করাই সঙ্গত হবে। বাকি বইগুলি সম্পর্কে মোটামুটি কিছুটা প্রসঙ্গগত পরিচয় এবং বিশেষ মন্তব্য প্রথমে করে নেওয়া দরকার। *অমাবস্যায় চাঁদের উদয়* বইটি কামরূপ-কামাখ্যার পটভূমিকায় শাক্ত-তান্ত্রিক সাধনার ও আচরণের পরিচয়-বাহী। কিন্তু এই উপন্যাসে ধর্মীয় পরিবেশটুকু যতটা স্পষ্ট করা লেখকের অভিপ্রেত, তার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছেন পবিত্রী মা, তাঁর শিষ্যা জগৎ এবং পবিত্রী মা-র সাধনগুরু প্রাণতোষ বাবা। এই উন্যাসের একটি বিরাট অংশ হল পবিত্রী মা ও জগতের সঙ্গে কালকূটের রেলের একই কামরায় দীর্ঘ ভ্রমণ ও ভাববিনিময়ের বৃত্তান্ত। বাকিটুকু কামরূপ-কামাখ্যায় প্রাণতোষ বাবার আশ্রমে গড়ে- ওঠা। বিশেষভাবে শাক্ত তান্ত্রিক ধর্মাচার বা রিচ্যুয়াল সম্পর্কে এই বই থেকে যতটা অনুপুঙ্খ আমাদের প্রত্যাশিত তা আমরা পাইনা। তার কারণ কালকূট এই বইতে বড় করে ধরতে চেয়েছেন সাধক-সাধিকাদের রহস্যময় অন্তর্গূঢ় স্বভাব। তাই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে পরিবেশগত ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারে লেখককে খানিকটা ছন্নছাড়া মনে হয়। প্রসঙ্গত এই বই প্রসঙ্গে কালকূটের জবানবন্দিটুকু উদ্ধৃতি যোগ্য।

> '*অমাবস্যায় চাঁদের উদয়*' মূলত একটি সাধনবিষয়, যা, প্রকৃতি-পুরুষের মিলনজাত।... আমি নিজে সাধক নই অতএব অভিজ্ঞতাও সাধকের নয়, সাধকের জবানি ও ব্যাখ্যা আমার মূলধন।... আমি নিজে শাক্ত পরিবারের সন্তান, ছেলেবেলা থেকে আমাদের গৃহে কিছু কিঞ্চিৎ ঘটনা আমি দেখেছি যা আমার অবুঝ মনে দাগ কেটেছিল, কিন্তু প্রকৃত কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। ... আমি আমার এই রচনায় বীরাচারি সাধকের কথা লিখেছি, যিনি আমাকে বারে বারে 'প্রেমসত্য' বলেছেন এবং আমার নিজেরও পরম প্রেমিক বলে মনে হয়েছে। সাধিকাকে মনে হয়েছে এক পরম প্রেমিকা। তাঁরা কেউ অতিমানব-মানবী রূপে

আমাকে দেখা দেননি। বরং রসের মানুষ ভাসছে প্রেমে এমনটিই দেখেছি।

শেষ বাক্যটিতে বোঝা যায় কালকূট ধর্মীয়তাকে কতটা সরলীকরণের মধ্যে নিয়ে যেতে চান। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রবাহিত ধর্ম-ধারণা সম্পর্কে যাঁরা সচেতন তাঁরা বুঝবেন যে বীরাচারি সাধকরা খুব সহজে প্রেমের কথা সাধারণত বলেন না। কেননা তাঁদের সাধনা মাধুর্যের সাধনা নয়। 'রসের মানুষ ভাসছে প্রেমে' এই ধরনের প্রকাশভঙ্গি শাক্ত সাধকদের সম্পর্কে বলা কালকূটের পক্ষে সহজ হলেও আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ নয়। বইটির ভূমিকায় লেখক আরও বলেছেন,

> শক্তি সাধনা বা তন্ত্র সাধনা আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ঠিকমত ভাগ করলে, তিনটি বিভাগ—হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, বাউলতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য সকলের এক। 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' এবং এই কথাটি প্রধানত বাউলরাই তাঁদের গানে বলেছেন।

হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, বাউলতন্ত্রকে একসঙ্গে উচ্চারণ করে কালকূট বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজে কতটা বিভ্রান্ত। তিনি কোনো জায়গাতেই এইসব তন্ত্রের সহজিয়া স্তরটি উল্লেখ করেননি এবং বিশেষভাবে সুফীতত্ত্বে আচ্ছন্ন শাসনিয়ন্ত্রণকারী মারফতি ফকিররাই যে *অমাবস্যায় চাঁদের উদয়* তত্ত্বের (যার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লালন শাহ্ এবং এই অসামান্য উচ্চারণটিও তাঁর) প্রবক্তা তা হয়তো তাঁর জানা ছিল না। বস্তুত কালকূটের বাউলদের সম্পর্কে অবসেশ্যন এবং সবকিছুর মধ্যেই বাউলতত্ত্বের সংযোগ আবিষ্কার আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও হাস্যকর লাগে যখন তিনি হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র ও বাউলতন্ত্র সম্পর্কে বলে বসেন 'লক্ষ্য সকলের এক।' ধারণা ও বিচারের এতবড় ভ্রান্তি থেকে উৎপন্ন *অমাবস্যার চাঁদের উদয়* উপন্যাসটি তাঁর প্রতিপাদ্যকে এলোমেলো করে দিয়েছে। তার ফলে এই উপন্যাসের সাধক-সাধিকা চরিত্রগুলি পাঠকের কাছে তাদের নিজস্ব আত্মস্থ মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং বচনসর্বস্ব উপরিস্তরের ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মতো লেগেছে। এর চেয়ে অনেক সহজে তিনি *মুক্ত বেণীর উজানে* উপন্যাসে শাক্ত সাধক খ্যাপা-বাবার চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মুক্ত বেণীর উজানে এবং *চল মন রূপনগরে* উপন্যাস দুটি কালকূটের ডকুমেন্টেশন জ্ঞানের অভ্রান্ত পরিচয়বাহী। বই দুটির মধ্যে বিষয় পরিবেশ ও চরিত্রগত কিছুটা মিলও লক্ষ করা যায়। *মুক্ত বেণীর উজানে* লেখা হয়েছে ১৯৮০ সালের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকার জন্য এবং *চলো মন রূপনগরে* লেখা হয়েছে ১৯৮১ সালের শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। একবছরের মধ্যেই লেখা বলে বই দুটির মধ্যে বিষয় ও পরিবেশ সম্মিতি যেমন আছে তেমনি মনে হয় বই দুটি পরস্পরের পরিপূরক। হুগলি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী প্রসারিত এক জনপদ এই দুটি উপন্যাসে রূপ পেয়েছে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই গঙ্গাতীরবর্তী বসতখণ্ড নানা সহজিয়া ধর্মমতের সাবলীল স্রোতে বিচিত্র। লৌকিক শাক্ত সাধক থেকে শুরু করে নানা বর্গের গৌণ সম্প্রদায়, নানা স্তরের সহজিয়া বৈষ্ণব আখড়া এবং মরমি সাধকদের আস্তানা এইসব জনপদের ইতস্তত কয়েকশো বছর ধরে রয়েছে। উচ্চবর্গের জীবনভাবনায় ও সামাজিক স্রোতে এইসব মানুষের কিছুমাত্র যে ভূমিকা আছে তা আমরা জানতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে কালকূটই সর্বপ্রথম তাঁর অসামান্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে খুঁজে নিয়েছেন এইসব সম্প্রদায়, তাঁদের আশ্চর্য লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণ, অন্য ধরনের বেশ কিছু মানব-চরিত্র। লক্ষণীয়, কালকূটের চোখে গৌণধর্মের পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি ধরা পড়েছেন। তাঁর সহানুভূতি ও মমতা যেন উপেক্ষিত দ্বিধাজড়িত অথচ জীবনের তাপে উত্তাল নারীজীবনের প্রতি ধাবিত হয়েছে। তার ফলে খ্যাপা-বাবা কিংবা গোলকদাস বাবাজির চেয়ে তিনি অনেক দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন গঙ্গা, যমুনা কিম্বা মনোহরার চরিত্র।

অথচ এইসব মানুষজন ও তাঁদের বিচিত্র গৌণধর্মের জগতে কালকূটের ঢুকে পড়াটা ছিল নিতান্তই আকস্মিক। হুগলির একটি অঞ্চলে আপন মনে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় তিনি জড়িয়ে পড়েন এক নিরুপায় শববহনের কাজে। শবটি ছিল একটি বৃদ্ধা বারাঙ্গনার। শব বাহিকারাও ছিলেন বারাঙ্গনা। এই অভিনব আয়োজনে কালকূটকে অংশ নিতে হয়েছিল অবতলের মানুষের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতি ও

মানবিকতার টানে। লক্ষণীয় যে কালকূটের বংশ কৌলীন্য ও শাক্ত সংস্কার তাঁকে বাধা দেয়নি। অত্যাশ্চর্য এই শববহনের পরিণতিতে তিনি পৌঁছন গঙ্গাতীরে এবং সেইখানেই শেষ পর্যন্ত তিনি গঙ্গাতীরে ভেড়ানো এক নৌকায় আশ্রয় নেন খ্যাপাবাবার সাহচর্যে। খ্যাপা-বাবা একজন লৌকিক শাক্ত সাধক অথচ তাঁর প্রধান কাজ হল অনাথা বালিকাদের ভরণপোষণ করে তাদের সংসারী করা। এমনই দুজন অনাথা মেয়ে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে কালকূটের পরিচয় হয় যাদের মধ্যে রয়েছে তীব্র জীবনস্পৃহা। এই নৌকায় করেই লেখক চলে আসেন গুপ্তিপাড়া ও কালনার মাঝামাঝি খ্যাপাবাবার আশ্রমে। এইখানে প্রথম উপন্যাসটির শেষ। দ্বিতীয় উপন্যাসটির শুরু হয় হুগলি জেলার ডুমুরদহ স্টেশন থেকে ভিতরের জনপদের পথে। সেইখান থেকে তিনি চলে আসেন শ্রীপুর আঁটিশ্যাওড়ায় গোলকদাসের আখড়ায়। এইখানে তাঁর সরেজমিন অভিজ্ঞতা ঘটে যায় সহজিয়া বৈষ্ণবদের আখড়া-আশ্রয়ী জীবনের সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যে এই মানুষগুলির জীবন-কথা, তাদের লোভ, ভক্তি, সাংসারিকতা প্রেম ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন দ্বিতীয় উপন্যাসটিকে চমৎকারিত্ব দিয়েছে। আখড়ার মহান্ত গোলকদাস শেষ-পর্যন্ত লেখকের কাছে ফুটে ওঠেন বৈষ্ণবতার আড়ালে এক প্রতিষ্ঠাকামী ক্ষমতাকামী ইন্দ্রিয়পর ভূস্বামীর মতো। অথচ সেই আশ্রমেই কালকূট পেয়ে যান মনোহবার মতো সব অর্থেই বিস্ময়কর নারীকে, যে প্রথম জীবনে ছিল পতিতা, পরবর্তীকালে পরিশুদ্ধা বৈষ্ণবী।

বাংলা উপন্যাসে জাত বৈষ্ণবদের কথা বা সহজিয়া আখড়ার প্রসঙ্গ খুব বেশি বিস্তারে আমরা পাই না। সেদিক থেকে *চলো মন রূপনগরে* উপন্যাসটি তাৎপর্যপূর্ণ। কালকূট তাঁর জীবন-অন্বেষার টানে এই উপন্যাসে এক অজানা সাধনার জগৎকে তুলে ধরেছেন। *গাহে অচিন পাখি* নামে একটি আত্মবিবৃতিতে কালকূট একদা আরশিনগর আর তার পড়শির অন্যান্য সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন,

> আমার আরশিনগর যদি হয় জগৎ ও জগৎজন, তাদের মধ্যে আমার পড়শি সত্তাটিকে সন্ধানী নামের আড়ালে ঘুরে ফেরা।

ইংরেজিতে একে আইডেন্টিফিকেশান বলে নাকি? আড়াল দিয়ে খুঁজে ফিরি বুঝি নিজেকেই।

আলোচ্য উপন্যাসে মনোহরা চরিত্রর মধ্যে কালকূট অনেক আত্মদ্যোতনার বাণী আমাদের সামনে এনেছেন। যেমন যে মনোহরা পতিতা তার সহজিয়া ধর্মের সহজিয়া মর্ম এমন কৌশলে কালকূট বাক্‌চাতুর্যে উপস্থাপিত করেছেন যে মনোহরা সম্পর্কে সম্ভ্রম জাগে। মনোহরার উপলব্ধি ও মরমিয়া জগৎকে কালকূট একটু অস্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন বোধ হয়। তবু মনোহরাকে ভালো লাগে, যে নিজেকে গ্রাম্য আখড়ার একজন সাধারণ বোষ্টমি বলে আখ্যা দিয়েছে। লেখক তার বাক্‌শৈলী ও অনুভূতিময় জীবনের যে পরিচয় রেখেছেন তা বাস্তব না হলেও মহৎ। মনোহরার কপালে রসকলির দাগ, কালকূটের হাতে ছাপ ফেলে, তিনি কাহিনির পরিণামে মনোহরার পায়ে নিজেকে নত করে উপলব্ধি করেন, 'নারী শক্তি স্বরূপিনী। ত্রিভুবনধারা। দেহস্বরূপিনী তুমি তপ, জপ। তুমি জননী, তুমিই সখী। তুমি প্রেম, তুমি ইষ্ট।'

পড়তে পড়তে বোঝা যায় কালকূট এই উপন্যাসের বাস্তবকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন, ডকুমেন্টেশ্যনের দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। উপন্যাস তার রহস্যময় বিস্তার নিয়ে কল্পনার ভাবালুতায় আমাদের টলিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ একটি গ্রাম্য বৈষ্ণব আখড়ার সমাজভ্রষ্ট এক অশিক্ষিতা বৈষ্ণবীর সঙ্গে কালকূটের আলাপচারির একটি নমুনা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

> মনোহরা এসে ঢুকল, 'একলা হলেই কেবল নদীর দিকে তাকিয়ে থাক? কী দেখ তাকিয়ে? 'মনের কথাটা মুখ থেকে খসে পড়ল, 'মনে হল নদী বড়ো একলা। একটা নৌকা নেই, মাঝি নেই।' 'তাহলে একলা নদীর জন্য তোমার মন কাঁদে?' মনোহরার ডাগর কালো চোখে বিস্ময়, 'তোমার মনের গতি কতদিকে। নদীর জন্য মন খারাপ করতে কাউকে আজ পর্যন্ত দেখিনি।'

উদ্ধৃতিটি বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে *মন চলো রূপনগরে* উপন্যাসটির পটভূমি লোকায়ত হলেও এর প্রধান নারী চরিত্রটি এবং তার

ভাবনাচিন্তা ও সংলাপের ধরন একেবারে অ-লৌকিক। তবু এই রচনাটি কালকূট রচনা সম্ভারে একটি বড় দিকচিহ্ন। অবশ্য নদীস্রোতের মতো এই উপন্যাসের কাহিনি সম্পূর্ণ অন্যদিকে বয়ে গিয়ে পরিণামে শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তার ফলে রচনাটির বৃহত্তর ঔপন্যাসিক সমন্বয় ও সংহতি থেকে কাহিনিটি ভ্রষ্ট হয়ে ছড়িয়ে যায় দিক্‌ভ্রান্ত ধূসরতায়। একটি চমৎকার লোকায়ত বর্গের ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা এইভাবেই করুণ নিঃশেষ মেনে নেয়।

কোথায় সে জন আছে উপন্যাসে কালকূট প্রথমেই ধরতে চান কল্যাণীর ঘোষপাড়ার সতীমা-র মেলাকে। এই উপন্যাসে তিনি কিন্তু একক সন্ধানী নন। তাঁর ভ্রমণসঙ্গী প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় ঘোষ বা কালপেঁচা। কথা-সাহিত্যিকের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকের এই জোড়কলম ভ্রমণের আয়োজন দেখে পাঠক হিসেবে আমাদের মনে জেগে ওঠে নানা প্রত্যাশা ও কৌতূহল। আমরা ভাবি ডালিমতলার মাটি, হিমসাগরের জল, ভাবের গীতের গান আর রামশরণ-সতীমা-র মিথ ভেদ করে হয়তো জেগে উঠবে এই উপন্যাসে একটি বিরল অনুসন্ধানের গহন বার্তা। কিন্তু ঘটনা সেপথে এগোয় না। গল্প ঘুরে যায় রঙ্গ-তামাসা-ঠাট্টায়। ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের অতবড় মেলায় তাঁরা খুঁজে পান না একজনও ভক্তিমান সাধককে। শুনতে পান না এক পংক্তিও ভাবের গীত, উদ্ধৃত করেন না এক পংক্তিও শব্দ গানের নমুনা। অথচ আমরা সরেজমিন পর্যবেক্ষণে একথা অনেকে জানি যে ঘোষপাড়ার মেলা উনিশ শতক থেকে বিতর্কিত, কিন্তু পর্যবেক্ষণযোগ্য। নিরপেক্ষ বিচারে এখানে কুসংস্কার থাকলেও মানবিকতা লভ্য। জাতিভেদের ঊর্ধ্বে, শ্রেণিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ কতটাই সত্যধর্ম যাজন করতে পারে কর্তাভজাদের মেলা তার একটি ফলিত শিক্ষাক্ষেত্র। মানবমিলনের এই মহাসম্মিলনের মহৎ তাৎপর্য কালকূটের কেন যে চোখে পড়ল না কে জানে! ব্যথিত হয়ে আমরা লক্ষ করি তিনি শুধু দেখতে পান লুব্ধ মানুষদের, শুনতে পান থিয়েটারের গান। ('দুনিয়া চিড়িয়াখানা / থিয়েটারে ভুলে আর যেও না')। অথবা আউলের ভণিতায় যে গানটি উদ্ধৃত করেন সে গানটি

একেবারেই ভেজাল। কেননা আউল বলে তো কোনো পদকার নেই। বরং আউলচাঁদ হলেন একজন সাধক। যিনি নাকি কর্তাভজা ধর্মের স্রষ্টা।

মনে হয় *কোথায় সে জন আছে* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কালকূট খুব সতর্ক বা অবহিত থাকেননি। এই লোকায়ত মেলার প্রসঙ্গটি কালকূটের মূল বসত নৈহাটি থেকে খুব তো একটা দূরে নয়। কিন্তু এই উপন্যাসের প্রথম থেকেই লেখকের মনে মেলাটি সম্পর্কে কেমন যেন তেমন প্রসন্নতা নেই। যাত্রাসূচনায় তাঁর মনে পড়েছে ছোটবেলায় ঘোষপাড়ার মেলায় যাওয়াই ছিল নিষেধ। অভিভাবকদের কথাবার্তার স্পষ্টই সংকেত ছিল ঘোষপাড়ার দোলমেলা নিষিদ্ধ স্থান। কেন যে নিষিদ্ধ তার কিছু কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কেবল ধর্মীয় নয়।

এই নিষেধ অমান্য করে কৈশোরে কালকূট একবার গিয়েছিলেন ঘোষ-পাড়ায়। আবার গেলেন বিনয় ঘোষের আহ্বানে। এই উপন্যাস সেই দ্বিতীয় ভ্রমণের বিবরণ ধর্মীয় নয়, অর্থাৎ অন্যতর কোনো নিষেধের সংকেত তাঁর মনে হয়তো জাগরূক ছিল, তাই এই মহান মানবিক সম্মিলনে তাঁর কোনো প্রাপ্তি ঘটেনা। তিনি যেন ঠিক ঠিক মানুষগুলিকেও দেখতে পান না। বরং ভ্রমণ-সঙ্গীর উৎকট কৌতূহল থেকে কতগুলি ভ্রষ্ট বিকৃত অদীক্ষিত কামুক গ্রাম্য শাক্ত সাধকদের বামাচার তাঁকে টানে। এই লোভী নির্লজ্জ কামাচারীদের অর্ধশত টাকা দিয়ে কালকূট ও কালপেঁচা চক্রসাধনায় প্ররোচিত করেন এবং ক্ষুধিত মানুষগুলির লোভ ও কাম দেখে দুজনে কৌতূক সহকারে আসর ত্যাগ করেন। সমগ্র ঘটনাটি যতটা রুচিহীন ও অমানবিক ততটাই একজন মহান লেখকের পক্ষে অমর্যাদাকর। কালপেঁচার জবানিতে লেখক লিখেছেন মানুষ কত সহজে কোথায় নামতে পারে সেটা দেখা গেল। কালকূট অবশ্য শেষপর্যন্ত বলেন, তার একটা কষ্টও হচ্ছে। মনে হল ওরা যেন অনেকদিন পরে তৃপ্তি করে পেট ভরে খেল।

অবশ্য সমাজ-সচেতন কালকূট কালপেঁচার মুখ দিয়েই একটা বড় কথা বলে নিয়েছেন। সেই কথাটি হল, গৌণ ধর্মের এই মানুষগুলি, এইসব ভ্রষ্ট সাধক, নষ্ট ভ্রষ্ট যাই হোক বেঁচে থাকার কী আপ্রাণ চেষ্টা। ওরা

তো ওদের নিজেরা সৃষ্টি করেনি। সমাজই করেছে। সমাজে সেই প্লাবনটা কবে আসবে জানিনে, যেদিন ওদের ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তুলবে।

এমন চমৎকার একটি বিশ্লেষণ শেষপর্যন্ত কোনো তাৎপর্য রাখে না যখন দেখি কালকূট ও তাঁর সঙ্গী চলে যান কালাচাঁদ ও কালোশশীর আসরে যারা বিশ্বাসে কর্তাভজা এবং দোললীলার আবিরে রাঙানো। বনগাঁবাসী এই ভক্ত দম্পতির সঙ্গে কালকূট ঘোষপাড়া ত্যাগ করে চলে যান হবিবপুরে মদনগোপালের মন্দিরে। সেখানকার লোকায়ত বৈষ্ণব পরিবেশে পাঠক যখন দুদণ্ড শান্তি পেয়ে একটা বিশ্বাসের জগতে পা রাখেন। তবু হঠাৎ সেখান থেকে কালকূট কাহিনিকে ঘুরিয়ে দেন অন্যদিকে এবং চলে যান দিগম্বর সেন নামে এক উদ্ভিদবিশারদ ও উদ্যানবিদের প্রকৃতি রাজ্যে। উপন্যাসটি এখানেই টাল খেয়ে মূল প্রসঙ্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়। কালকূটের এই জাতীয় ভ্রমণধর্মী বই পড়ে মনে হয় তাঁর বলার কথার চেয়েও দেখানোর ঝোঁকটা যেন বেশি। তাঁর যেন কোনো কেন্দ্রীয় বক্তব্য নেই। কিন্তু আর পাঁচটা মানুষের মতো যে তিনি নন, তাঁর যে আছে বিশিষ্ট দুটি দেখার চোখ ও একটি বোঝার মন *কোথায় সে জন আছে* উপন্যাসে তাঁর সেই পরিচয় ফুটে উঠল কই?

একেবারে মনে হয়, সামাজিক মানুষ হিসোবে এমন কতগুলি অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল যা হয়তো খানিকটা অসামাজিক, ছন্নছাড়া বা গড়পড়তা মূল্য-বোধের বিপ্রতীপ। অথচ মানুষ হিসাবে যেসব বিষয়ে ছিল তাঁর সমর্থন। কালকূটের মতো ভেতরে সেই অভিজ্ঞতায় জারিত বিষ কণ্ঠধার্য করে আমাদের তিনি দিতে চেয়েছেন কেবল অমৃতটুকু।

এই আত্মসন্ধানী কালকূটের তৃতীয় রচনা *কোথায় পাবো তারে* বই হয়ে বেরিয়েছে ১৯৬৮ সনে। তার আগে কালকূটের আর দুটি বই বেরিয়েছে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে (১৯৫৪) এবং স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে (১৯৬৫)। কোথায় পাবো তারে সমরেশের চুয়াল্লিশ বছর বয়সের রচনা। এতটা বয়সের মধ্যে কালকূটের রচনাসংখ্যা মাত্র তিনখানি, অথচ সমরেশের বইয়ের সংখ্যা ১৯৫১ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে কুড়িটি উপন্যাস ও গল্প সংকলন। এই তথ্যটুকু নজরে রাখলে বোঝা যাবে

সমরেশের বিপুল রচনা সামর্থ্যের পাশে কালকূট কতটাই মিতলেখনী। তার কারণ কী? কারণ এইটাই যে, আত্মসন্ধান তো বিরলতম অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে। প্রবাহিত জীবনের ঘটনাস্রোতে মানুষ ভেসে চলে সর্বদা, কিন্তু আত্মানুসন্ধানের অবকাশ তেমন ক্ষণে ক্ষণে ঘটেনা। 'কবে তুমি আসবে বলে' কোনো সৃজনশীল লেখক তো বসে থাকতে পারেন না, তাঁকে চলতেই হয় 'বাইরে'। কিন্তু মাঝে মাঝে আসে সেই দুর্লভতম আত্মবীক্ষণের চকিত ক্বচিৎ সংঘটন।

সমরেশ বসুর প্রয়াণের পরে 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণসংখ্যার (১৪ মে ১৯৮৮) একটি লেখায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ('*অমৃতপথের যাত্রী*') জানিয়েছেন,

> তাঁর বই যে খুব বিক্রি হত তা নয়। খুব যে জনপ্রিয় ছিলেন এমনও বলা যাবেনা। তবু কয়েক দশক ধরে সিংহের মতোই বিচরণ করেছেন সাহিত্যের অঙ্গনে। দাপটে, রাজার মতো। প্রতিষ্ঠা ছিলই, তারচেয়ে বেশি ছিল খ্যাতি। ... তাঁর সম্পর্কে 'পাওয়ারফুল' কথাটি খুব শোনা গেছে।

কথাগুলি হঠাৎ শুনলে স্ববিরোধী লাগে। দাপট ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল (পেছনে প্রতিষ্ঠানও ছিল,) খ্যাতি ছিল, শক্তিময় লেখনী ছিল, অথচ জনপ্রিয় ছিলেন না। বরং বলা চলে, বিতর্ক ছিল তাঁকে নিয়ে। বিতর্কও আসলে এক ধরনের স্বীকৃতি। তাঁর জীবনকাহিনি জানতে চাইতেন অনেকে, তাঁর জীবনযাপনের ধরন সম্পর্কে কৌতূহল ছিল সকলের। চাকরি না করা পুরোদস্তুর সাহিত্যজীবী তাঁর মতো আর কেউ ইদানীং ছিলেন না। এইসব মিলিয়েই সমরেশ বসু ছিলেন প্রবলভাবে এবং তাঁর কব্‌জির জোরে।

কিন্তু নিছক কব্‌জির জোরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা মেলেনা। আসলে তাঁর রচনায় এক ধরনের শক্তি যেমন ছিল তেমনই ছিল এক ধরনের সত্যেরও বনিয়াদ। জীবন তাঁকে সেই সত্যের বিচিত্র জটিল মুখ দেখিয়েছিল। এইটাই তাঁর সৌভাগ্য যে জীবনটি গড়পড়তা মানুষের মতো কাটেনি। যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্বতই দেখেছিলেন জীবনের

শতধা রূপ, আর ছেঁকে নিয়েছিলেন তার অন্তর্গত রস। সারাজীবনই তাঁর ছিল এক বালকস্বভাব। কেবলই গ্রহিষ্ণু, কেবলই অশান্ত, বিচরণশীল। তাঁর ছিল সব অর্থেই মধুকরবৃত্তি।

সমরেশ বসুর সাহিত্যসৃজনে মাধুরীক্ষরণের অবকাশ কম, ভ্রমর দংশনের গূঢ়ক্ষত অনেক বেশি। সেইজন্যই তিনি কবি নন, কাহিনিকার। অথচ একই দেহে যেমন থাকে ভোগী আর যোগী, তাঁর ছিল তেমন। এদেশের গানেই তো প্রেমিককে সাধক বলা হয়েছে। তাঁর জায়মান জীবনের তন্ত্রীতে যে সুরের কম্পন উঠত তাঁর অন্তরে মনে হয় যেন 'বৈরাগীর লাউ' বাজে।

সমরেশ কতটা জনপ্রিয় লেখক জানিনা, তবে কালকূটের লোকপ্রিয়তা সন্দেহাতীত। *কোথায় পাবো তারে* ১৯৬৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর মুদ্রণের ভাগ্য পেয়েছে। এ বই জনাদৃত এবং সমরেশেরও অন্যতম প্রিয় রচনা। এখন আমাদের বুঝতে হবে *কোথায় পাবো তারে* বইটির জনাদরের ভিত্তি কোনখানে। অবশ্যই বিষয়বস্তুর নতুনত্বে এবং বিচিত্র অদেখা চরিত্রগুলির জীবনধর্মিতা ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সমাদরের উৎস আছে। আরেক কারণ পটভূমি ও পরিবেশ। এটা ঠিক যে কালকূটের আগে উপন্যাসের ছকে বাউল বৈরাগিদের জীবনতত্ত্ব এমন করে, এত অন্তরঙ্গতায় আর কেউ ফোটাননি। তবে *কোথায় পাবো তারে* এই বিচিত্র প্রসঙ্গে প্রথম কথাকাহিনি হয়তো নয়। গীতিকার হীরেন বসু *একতারা* নামে এক উপন্যাসে কর্তাভজাদের জীবনতত্ত্ব দেখিয়েছিলেন। খুঁজলে এমন খুচরো কিছু লেখার কথা জানা যাবে। অবশ্য *কোথায় পাবো তারে* প্রথমতম না হলেও নিঃসন্দেহে এ প্রসঙ্গে সফলতম রচনা, তার শৈলির কারণে, অভিজ্ঞতার সত্যে এবং বিন্যাসের যথাযথতায়।

সমরেশ ও কালকূটের উপন্যাস কোনো তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা থেকে বড় একটা গড়ে উঠত না। অনেকদিনের অনেক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নির্মাণ করত তাঁর কাহিনিবৃত্তের পরিধি। *টানাপোড়েন, জগদ্দল* যেমন *কোথায় পাবো তারে* তেমনই মূলত '*ফিল্ড ওয়ার্ক*'-করা রচনা। এখানে গল্পের খাতিরে একটা ভূখণ্ডের পরিচয় আছে, আছে লৌকিক

বাগ্‌ধারার দোলাচল, কিন্তু আসল দ্রষ্টব্য তাঁর মানুষ। প্রশ্ন ওঠে, এ মানুষগুলি কি একালের না চিরকালের? সভ্যজগতের শিক্ষিত মানুষগুলি তো নিতান্ত একালের। যেমন অচিনবাবু বা মিনি। কিন্তু সাঁওতালদের কৌম সমাজ কিংবা গোপীদাসদের বাউল-বিশ্ব যেন চিরকালের বিশ্বাসে বাঁধা। তবু মনে রাখতে হবে, কোনো esoteric cult-কে বিশেষ করে বোঝাবার দায় তাঁর ছিলনা। কিন্তু তিনি ধরতে চেয়েছেন মধ্যযুগ থেকে বাঙালি মিশ্র সমাজের অন্তঃস্তলে অন্তর্স্বভাবী জীবনযাপনের এক লোকায়ত বিশ্বাসের বনিয়াদকে। সে কেবল দরবেশ বা বাউলদের ঘিরেই নয়, অঘোরপন্থা ও তন্ত্রসাধনাকেও নিয়ে, এমন কী আদিবাসীদের মুক্ত জীবনশাস্ত্রেও। তবু *কোথায় পাবো তারে* আমাদের সামাজিক নৃতত্ত্বের কোনো ডকুমেন্ট নয়, এটি এক মহৎ কথাসাহিত্য।

কথাসাহিত্য বলেই এর একটা নির্দিষ্ট পটভূমি আছে এবং আছে আঞ্চলিক ডায়ালেক্ট। চব্বিশ পরগণার টাকি-হাসনাবাদ অঞ্চল থেকে *কোথায় পাবো তারে*-র অন্বেষণের শুরু, যার ভরকেন্দ্র এক গাজী চরিত্র। এ পরিক্রমার শেষ (আসলে কিন্তু অশেষ) বীরভূমের নানা অঞ্চল ঘিরে। বিশেষভাবে বীরভূম এ-কাহিনির বড়ো অংশ, কেননা সেখানকার ভূ-প্রকৃতি যেমন কোমলে-কঠোরে মেশানো, তেমনই মিশে গেছে শাক্ত-বৈষ্ণব, সহজিয়া-বৈরাগীপন্থা। মিশে গেছে রুদ্ধ সামন্তপ্রথা ও লোকায়ত মুক্ত জীবনবিশ্বাস। ছোটো শাখানদী যেমন করে বড় নদীতে পড়ে স্রোতোবহা হয়, এ কাহিনির গাজীর গল্প তেমনই মেশে বাউলের সমাহিত জীবন বিস্তারের ঢলে। তাতে বহতা আসে।

কালকূট তাঁর কৌশলী কলমের আঁচড়ে বোঝান, চব্বিশ পরগণার প্রান্তীয় ভাষায় যেখানে বলা হয় 'যাওয়া হবে কম্‌নে' তাই-ই বীরভূমে গিয়ে দাঁড়ায় 'কুথাক যাবেন' এই বাগ্‌ধারায়। এ তো কেবল বাগ্‌বিধির তফাত নয়, বদলে যায় জীবনবিন্যাসের সংস্কৃতি। গল্পের টানে, চরিত্রের সমন্বয়ে ক্রমশই জনগোষ্ঠীতে ছড়ায়। গাজীর একক চরিত্র থেকে বীরভূমের ব্যাপক বাউল সমাজে। শেষ কথাটা একই থাকে। জানা যায় গাজী আসলে সর্বত্যাগী কৌমার্যময় দরবেশ নয়, তেমনই জানা যায়

গোপীদাসের জবানিতে, সব বাউল বাউল নয়। বেশির ভাগই পতিত ভ্রষ্ট। যদিও কেউ নিয়েছে মুরশেদের নামে মজদুরি, কেউ গাইছে অবিরলধারে দেহতত্ত্বের গান, আসলে সবাই মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু। স্বয়ং কালকূটও তাই। সুখের খোঁজে না গিয়ে কেবলই ত্রাণের খোঁজে যাওয়া বোধ হয় এ কাহিনির সকলেরই অব্যর্থ ললাটলিপি।

এ বইয়ের থিম সঙ প্রত্যক্ষত 'আমি কোথায় পাবো তারে' মনে হলেও আসলে মূল গান হল, 'যে জন প্রেমের ভাব জানেনা / তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা'। প্রেমই এ গল্পের চালিকাশক্তি কখনও তা ভাব আর ভাবীর প্রেম, কখনও বিয়ে-না-করা মাহাতো দম্পতির, কখনও গোকুল আর বিন্দুর মধ্যে, কখনও কার্তিক আর যোগোর, কখনও গোপীদাস আর রাধা বৃদ্ধার, আবার ধনু ও তৃপ্তির। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে কিশোর-কিশোরী। কালকূট এ কাহিনিতে প্রেমের বিচিত্র অন্তঃপ্রকৃতি দেখিয়েছেন। সেই যে বলা হয়েছিল শাস্ত্রে 'অহেরিব গতি প্রেম্না স্বভাব কুটিলা ভবেৎ', এও তাই। প্রেমের এই কুটিল স্বভাব সর্পিল গতি এঁকেছেন কালকূট। তিনি নিজেও সেই গতি পথের যাত্রী।

প্রেমের যে স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য কালকূট ধরতে চান এ রচনায় তাকে নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে,

'প্রেম নামে নদী, সে চলে অদেখায়। তাকে দেখে তরী বাইবে, সে কাণ্ডারী নেই।'

এই অদেখায় চলে যে প্রেমের ফল্গু তাকে দৃশ্যমান করাই কালকূটের কাজ, তাই তিনিই সেই কাণ্ডারী। তিনি কাণ্ডারী কারণ তাঁর জানার আকাঙ্ক্ষাটা বড় সত্য আকৃতিতে ভরা। 'আমি কোথায় পাবো তারে'—এ তো সার্বিক বাউল জীবনের আকাঙ্ক্ষা নয় কেবল, এ তো ব্যক্তিরও আততি।

এখানে অবশ্য মনে রাখা ভালো, বাউল গানের মধ্যে থাকে এক ধারাবাহিক তত্ত্বের সম্প্রসারিত স্রোত। স্রোতের বাঁকে বাঁকে একটা ঢেউ ওঠে। সেই উচ্ছ্রিত ঢেউ এক একটা গানের ধরতাই। বাউল গানের প্রথম ধরতাই যদি হয় 'আমি ছিলাম কোন্‌খানে আমারে আনলে কোন্‌জনে',

তবে এর পরের ধরতাই 'আমি কোথায় পাবো তারে'। এর মূলে আছে পিতৃবস্তু বা বিন্দুতত্ত্ব। অর্থাৎ বিন্দু থেকেই উৎপত্তি, সেই বিন্দুকেই অটল করে তাকে পেতে হবে। পাবার পথ হল আরশিনগরে পড়শিকে খোঁজা, অর্থাৎ ভ্রূমধ্যের আজ্ঞাচক্রে যোগধ্যান। দমের কাজ করে বীর্যরক্ষা, তার চলাচল, প্রকৃতিসঙ্গে তার যুগ্মভাবে উপলব্ধি, তাকেই বলে এক মরণে দুজন মরা। এ করণসিদ্ধি কঠিন, পতনের পথ বরং সহজতর। কালকূট দেখান, কত আকুলতায় বাউল গোপীদাস তার ভ্রংশের কথা বলে, দরবেশ গাজী ভ্রষ্ট হয়ে পরিণত হয় গরিব এক অসহায় পিতার দেহ সর্বস্বতায়। কার্তিক মাসে এক ব্রাহ্মণ তনয় শাক্ত যোগো নামের এক সধবা তাঁতি বউয়ের পায়ে ধরে সাধন ভজনের আকুতিতে। গোকুল আর বিন্দু দাঁতে দাঁত চেপে উজানে বাইতে চায় তাদের বাউল-দেহ। বিন্দু নামটি এখানে প্রতীকী। তাকে ধরেই সাধনা। যোগো নামটিও দ্যোতক। পারের মাঝির নাম যে অধর তারই বা কি কম তাৎপর্য?

কালকূট এসব তত্ত্বকথা অনেক সময় সাঁটে বলেছেন, বুঝিয়েছেন ঠারে ঠোরে। সবাই বুঝেছেন এমন নয়। তাতেও ক্ষতি নেই। তত্ত্বের উপরিস্তরে আছে জীবনরস। সেটা সবাই বুঝতে পারবেন। সেই জন্য কালকূট বুনে দেন তত্ত্বের আচ্ছাদনরূপে এক ডজন রোমান্টিক গল্প। তাই তত্ত্ব না বুঝলেও ক্ষতি হয় না। শাঁস না পেলেও জল তো মেলে।

কিন্তু শাঁস বাদ দিয়ে রস উপন্যাসে চললেও বাউল দর্শনে চলে না। কারণ তারা বস্তুবাদী, বড়জোর বলা যাবে তাদের দেহাত্মবাদী। কিন্তু তারা রোমান্টিক নয়, যেমন ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বাউলদের দর্শনকে উপনিষদের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। কালকূট এসবই জানেন বোঝেন, তবু তাঁর ঝোঁক রসবাদের দিকে। পাঠকের খুঁতখুঁতে মন, অনুসন্ধানী মনন *কোথায় পাবো তারে* রচনায় যতখানি প্রগলভ জীবনের উৎসার খুঁজে পাবে ততখানি তত্ত্ব পাবে না। বাউলদের আর্কিটাইপ ছাপিয়ে তাই এ কাহিনিতে একজনও অনন্য চরিত্র জেগে উঠতে পারে না। এখানে রচনাটির দুর্বলতার দিক।

অথচ সবলতার দিক সেইখানে, যেখানে কালকূট তাঁর জীবনব্যাপী

চঞ্চল সত্তা আর তার অন্বেষণকে মেলাতে পারেন বাউল কিংবা লোকায়ত দর্শনের গভীরে। এই আইডেন্টিফিকেশান একেবারে নিখুঁত। তার প্রথম ধরতাই এইরকম,

'নিজে তো জানি, কর্ম আমাকে কখনও সোজা পথ দেখায়নি। কঠিন যত বাঁকা তত। মুখ তোলবার আগে জীবনস্রোতের ঝাপটায় ভেসে গিয়েছি অন্যদিকে।'

যোগো ভৈরবী আর ব্রহ্মানন্দ অবধূতকে দেখে কালকূট যে সিদ্ধান্ত করেন তা তাঁর জীবনের আরেক ধরতাই। বলেন,

> রাঁধে বাড়ে খায়, ঝগড়া বিবাদ করে। হয়তো কাঁদালে কাঁদে, হাসালে হাসে। সুখ দুঃখ নিয়ে ফেরে একের পিছে পিছে। মরম ফেরে পরমের পিছে পিছে। একে যদি তুমি সাধন-ভজন বলো তবে তাই।

হয়তো এসব কথার পিঠে পিঠে রবীন্দ্র-গান 'জানি নাইতো সাধন তোমার বলে কারে' বাণীপুঞ্জ ধ্বনিত হবে কারো কারোর শ্রুতিতে। তবে কথাটা একই। কালকূট সাধক বলেই প্রেমিক। পরমকে তিনি চান বলে মরণকে আশ্রয় করেন। আর একথা ঠিক যে, *কোথায় পাবো তারে* বইটি মর্মস্পর্শী কেবল নয়, মর্মভেদী ও বটে।

মর্মভেদী, কেননা এ কাহিনি শেষ পর্যন্ত মর্ম অন্বেষণের কাহিনি, যার 'মর্ম বোঝা ভার'। সাপের মুখে ভেকের নাচনের মতো কিংবা জল ছিটিয়েও জল না মাখার যে গহনতা তা নানাভাবে ফুটে ওঠে খণ্ড কাহিনির দ্যুতিতে। কালকূট অচঞ্চল রূপদর্শকের মতো তন্ময় নিবিড়তায় শুধু দেখে যান না, দরদির মতো নিজেকেও সম্পৃক্ত করেন।

বইটির আরেক বিভা ঝলকে ওঠে এই অনন্যতায় যে কালকূট মনে রাখেন, তিনি বাঙালি বা ভারতীয়। তাই *কোথায় পাবো তারে* শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিক উচ্চারণে আবদ্ধ থাকে না বা কোনো কাল্টের রিচ্যুয়াল সঙ হিসেবে বাজে না। এ যেন এক সার্বিক আততি, বীরভূমের মলুটিতে দেখা সাঁওতালদের গণমিলনের মতো। কোন এক আকাঙ্ক্ষায়, কী এক নিবিড়তায় যেন ধ্বনিত হয় আর্তি। এতো কোনো একক মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা

নয়, সার্বিক-সামূহিক। তাই কালকূট বুঝিয়ে দেন, কেমন করে ক্ষুৎকাতর গাজী অনায়াসে বলতে পারে 'জাতের নাম ছাড়ো, জীবনকে পুজোয় লাগাও'। এবারে সম্প্রসারণে কালকূট বলেন,

> এখন কোন্ পুজোতে লাগবে তুমি, কী তার মর্ম, তা বোঝো তো মনে মনে।... জীবন কাটে যার দরজায় দরজায়, পথে পথে নামের গান করে, হাত পেতে যার ভরণপোষণ, সে এসব কথা পায় কোথায়। ভাবে কেমন করে।

এই ধন্দের উত্তর কালকূটই দেন,

> বিদেশের কথা জানি না।...কিন্তু ভারতবর্ষের দরজা খুলে উঁকি দাও। দেখবে হাটের মাঝে, চালচুলোহীন মানুষ তত্ত্বকথা বলে। গাছতলাতে নগ্ন মানুষ জীবন ব্যাখ্যা করে। এই দেশেতেই আছে কেবল, সোনার মুকুট ছেড়ে রাজার ছেলে বটতলাতে রাজার রাজা সাজে। আলখাল্লা গায়ে তুলে ঊর্ধ্ব বাহু নাচে।...কেতাব পুঁথি রাখো, এমন জায়গায় এমন জিনিস পৃথিবীর আর কে আমাকে দেবে।

এবারে বোঝা গেল *কোথায় পাবো তারে* আসলে এক ভারতীয়ের আর্ত অনুসন্ধানের কাহিনি। কতটা তাঁর আত্মার তার চেয়ে আত্মীয়ের অনুসন্ধান। সেই অন্বেষণে যেসব ভদ্রেতর ও অন্ত্যেবাসী মানুষজন সামিল হন, তাঁরা যেন চিরায়ত ভারতীয় জনজীবনের গাঢ় স্পন্দে নিত্য জীবিত। কালকূট আত্মসন্ধানের গভীর নির্জন পথে পেয়ে যান অনেক সহযাত্রী। তাদের সবাই কৃতার্থ বা সফল নন, তাই তো অশেষ সেই অন্বেষণ।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন কালকূট তাঁর এই অন্বেষণের পরিমণ্ডলটুকু খণ্ডিত রাখলেন কেবল বীরভূমের ভূখণ্ডে। বাউলদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সমাবেশ যেখানে সেই নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-যশোহর কেন ঘুরে দেখলেন না? দেখলে তার আঁকা বাউলজীবনের সমান্তরালে ফুটে উঠতে পারত সহজিয়া বৈষ্ণবদের জগৎ আর ফকিরদের আশ্চর্য মায়াবী সন্নিবেশ। তা হয়নি। আরেকটা অসম্পূর্ণতা মনে হয় তাঁর আত্ম-তৃপ্তিজাত। কেন যেন তাঁর অঙ্কিত লোকায়ত সাধকদের বেশ রোমান্টিক লাগে। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা তো তা নয়।

কথাটা খুলে বলা যাক। আমাদের দেশে বহুকাল থেকে বাউল বৈরাগি দরবেশ ফকিরদের খুব একটা উঁচু চোখে দেখা বা দেখানো হয়নি। তার কারণ তারা সমাজছুট এবং নিম্নবর্গীয়। তাদের জীবনে তেমন কোনো বাঁধন নেই, আচরণে নেই শরিয়ত বা বেদসম্মত গার্হস্থ্য। মৌলবি বা সমাজপতি ব্রাহ্মণকে আর তাঁদের শাস্ত্রকে তারা মানেনি কোনোদিন। গ্রামে থেকেছে অন্ত্যেবাসী হয়ে। তীর্থ, ব্রত, উপবাস, নামাজ, কলেমা বা উপবীতকে তারা মান্যতা দেয়নি। এমন কী বিবাহ বন্ধনকে বোধ করেনি আবশ্যিক বলে। তাই কোনোকালেই তারা সমাজের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠা পায়নি, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা জোটেনি। অথচ মূলত মানুষভজা সংবেদী এমন মানুষগুলি সমাজ কাঠামোয় কোনো সংকট সৃষ্টি করেনি কখনও বরং সমন্বয় মন্ত্র দিতে গিয়ে তারা সংকটাপন্ন হয়েছে বারেবারে। ধর্মধ্বজীরা তাদের একতারা ভেঙে দিয়েছে, আখড়া জ্বালিয়েছে, করেছে সর্বকেশ কর্তন। প্রতিরোধ তারা করতে পারেনি, প্রতিবাদও তেমন করে নয়। কেননা তাদের জমি নেই, সংঘ নেই। তারা ছড়িয়ে থাকে স্বতঃবিচ্ছিন্ন নানা ধ্বস্ত জনপদে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা শরিয়তি ইসলামের মতো তাদের মাথায় কোনো সংগঠিত সান্ত্বনা ও জনশক্তির ছাদ নেই। কালকূটের রচনা পড়তে পড়তে তাই সঙ্গত কারণে মনে হয়েছে, বুঝি তাঁর দরদি পর্যবেক্ষণ ধরবে এই মানহারা মানুষদের মূক সংকটকে। তবে কি তিনি এসব জানতেন না? শোনেননি কারুর কাছে? শুধু তাদের দারিদ্র আর ভিক্ষাজীবিতা চোখে পড়ল তাঁর? তাদের স্পষ্টতর অস্তিত্বের সংকট, গানে গানে ব্যক্ত তাদের প্রতিবাদ, তাদের বিরুদ্ধে গর্জমান প্রতিশোধকামী প্রেক্ষিত কেন কালকূট আঁকলেন না মরমি কলমে এ আক্ষেপ থেকে যায়। থাকে আরও এইজন্য যে কালকূট আদ্যন্ত একজন সমাজসচেতন লেখক এবং তাঁর মুখ্য দায় মানুষের সপক্ষে। কিন্তু যে দায় এড়িয়ে তিনি ভেসে যান বাউল-বাউলানির দেহসাধনার কঠিন আয়াসের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে, নানা অসম আসঙ্গলিপ্সার বর্ণনায় এবং ক্ষুৎকাতর বিকৃত কামাচারীদের নিয়ে পরিহাসে। লোকসংস্কৃতির আর পাঁচজন শহুরে সৌখিন গবেষকের মতো কালকূট যে থেকে যেতে পারেন লোকায়ত

জীবন সংগ্রামের বাইরের ছকে এ আমরা ভাবতে পারি না। কেননা কালকূটের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বড় সত্যস্পর্শিতার সাহস।

তবু নিঃসন্দেহে এ বই বাংলা কথাসাহিত্যে একটি কীর্তিস্তম্ভ। কেবল অজানা গভীর নির্জন জগতের পরিচায়ক বলেই নয়, মানুষের আত্মসন্ধানী অভিনিবেশের জন্যও। কালকূট ফুটিয়ে তুলেছেন কতগুলি আর্ত রুধিরাক্ত মানুষের অসহায় পরিক্রমণের দৃশ্যচিত্র। সেই দৃশ্যের অন্তরে আছে ধ্যান, যা মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। এখানে বিষয় আর বিষয়ী এক হয়ে গেছে। যখন কালকূট লিখছেন,

'আজও তাই দেখি, দুচোখ ভরা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। কিন্তু কিসের খোঁজে, সেই অরূপের কী নাম, কে জানে। বেড়িয়েছি অনেককাল, চলেছি কালান্তরে।' তখন তাঁর খোঁজা আর সাধক অন্ত্যজদের খোঁজা এক সমতলে অবশ্য দাঁড়ায় না। কিন্তু *কোথায় পাবো তারে* গ্রামীণ লোকায়ত থেকে শুরু হয়ে নাগরিক ব্যক্তি অন্বেষার পরমবিন্দুতে দাঁড়াতে চায়। সেইজন্যই তা আধুনিক মনের এত উপভোগ্য।

কালকূট তাঁর সমস্ত রচনার কোথাও পাণ্ডিত্যের ভান করেননি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ভান নেই বলে কিংবা রূপের পথে রসের অন্বেষী বলে তাঁর বেশ কিছু লেখার উপাদানের মধ্যে যেসব চিন্তা ভাবনার বিভ্রাট আছে বা স্বকল্পিত ব্যাখ্যা আছে তা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। সম্ভবত কালকূট এদিকটা কখনও ভেবে দেখেননি। কিন্তু মনে রাখতেই হয়, যেসব গূঢ় লোকায়ত আচরণবাদী ধর্মের প্রসঙ্গ ও তার খুঁটিনাটি তিনি তুলেছেন তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা তথ্যনিষ্ঠ। সমরেশ বসুর অনেক লেখায় নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও নিপুণ তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় আমরা দেখেছি। সেই অনুপাতে কালকূটের বেশ কিছু উপন্যাসের কিছুটা শৈথিল্য বা ভাবাবেগচালিত সরলীকরণের ছাপ আছে।

বাউল সাধনার যে চিরায়ত ধারা তার একটি অংশের নাম মারফত বা মারিফত। এই ধারার প্রধান কথাই হল দেহকে দিয়ে পরমের উপলব্ধি। সেই কাজে সাধকের ক্রমোত্তরণের এক একটি স্তর আছে। চরম স্তরে

গিয়ে সাধকের মধ্যে দেহাত্মবুদ্ধি জাগে। শরীরের শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে সাধক নিজের বিন্দুকে স্ববশে নিয়ে আসেন। মারফতি ফকিরদের মধ্যে পদরচয়িতা হিশাবে যিনি সবচেয়ে সফল সেই লালন ফকির একটি গানে লিখেছিলেন,

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার ঘরের কাছে আরশিনগর
সেথা এক পড়শি বসত করে।

এই গানের মারফতি তত্ত্বকথা হল শরীরের মধ্যে অজানা ও অচেনা বিন্দুর অবস্থানরহস্য। কালকূট কিন্তু অনায়াসে লিখে দিয়েছেন, আরশিনগর মানে নিজের দেহ আর পড়শি হল সাধক সত্তা। একে বলা যেতে পারে ধারণাগত ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি থেকে যিনি *কোথায় পাবো তারে* এই লক্ষ রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর পক্ষে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া অনিবার্য। ফলত কালকূটের লোকায়ত বর্গের রচনাগুলিতে এই জাতীয় দিশা হারানোর ঘটনা বারে বারেই ঘটে যায়। যেমন *চলো মন রূপনগরে* উপন্যাসের জনৈক অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই-এর সংলাপে সহজিয়া বৈষ্ণবের একটি আখড়া সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

> শিষ্যা আছে অনেক, আখড়া চলে ভালো। তবে নেহাত নেড়ানেড়ির আখড়া নয়।...রাধা-কৃষ্ণ গৌর-নিতাই। তবে বাউলের সঙ্গে বিশেষ-তফাত নেই।

এই সংলাপে নেড়ানেড়ির আখড়ার উল্লেখ রীতিমতো অনৈতিহাসিক। কেননা দু-তিনশো বছর আগেই, নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের বিলয় ঘটেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই না-হয় বাউলদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের বিশেষ তফাত খুঁজে পাননি, কিন্তু কালকূট নিজেও *কোথায় পাবো তারে* উপন্যাসে বলে বসেছেন, বাউল-বৈষ্ণবের তফাত কোথায় কতখানি জানি না। তফাত আছে শুনেছি। সত্যিই যদি এই তফাত তাঁর না জানা থাকে তবে তাঁর কাছ থেকে সুবিচার পাওয়া কঠিন। কেননা বাউল-বৈষ্ণবের তফাত শুধু বিশ্বাস বা তত্ত্বের নয় বরং আচরণগত। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য কিছু মিল আছে ঠিকই, তবে গরমিল যথেষ্ট।

কোথায় পাবো তারে উপন্যাসে তিনি গোপীদাস ও রাধাবৃদ্ধার যে চরিত্র দুটি এঁকেছেন এবং তাদের ধর্মজীবনের অনুষঙ্গে যেসব গান সংযোজন করেছেন তা বাউল গান নয়। সেগুলি বংলার সহজিয়া বৈষ্ণব গান। প্রসঙ্গত জানানো উচিত যে বাউলরা কখনও সহজিয়াদের গান গায় না। কিন্তু *কোথায় পাবো তারে* উপন্যাসে বিন্দু নামে বাউল চরিত্রটি গেয়েছে—

সাধিবি মনের কাজ—
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে তো রসিক রাজ।

এই গান বিন্দুর মতো চরিত্র তত্ত্বত গাইতে পারে না। আসলে কালকূট বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে কেন পার্থক্য করতে পারেননি তার কারণটিও এখানে অনুমান করা যায়। তিনি বর্ধমান ও বীরভূম এলাকার লৌকিক ভাবসাধকদের সঙ্গ ও সংস্পর্শ করেছেন বেশি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-যশোহর ও উত্তরবঙ্গের মারফতি বাউলদের একেবারেই দেখেননি। এসব বিষয়ে যাঁরা সরেজমিন ঘোরাফেরা করেছেন তাঁরা জানেন যে বর্ধমান-বীরভূমের বিস্তৃত রাঢ়খণ্ডে বিশেষত ত্রিবেণী-কালনা-দাঁইহাট-পাটুলি-অগ্রদ্বীপ-কাটোয়া প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী জনপদে এবং অজয় তীরবর্তী বীরভূমের নানা জনপদে বাউল নামে যারা নিজেদের পরিচয় দেয় তারা আসলে অনেকেই বাউল নয়। তারা প্রধানত জাতি-বৈষ্ণব অর্থাৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা ধিক্কৃত ও ঘৃণিত লৌকিক বৈষ্ণব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এইসব জাতি-বৈষ্ণব সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার কারণ হল এরা মূলত সমাজের নিম্নতর বর্গ থেকে আসা। বৈষ্ণবদের আরেকটি বড় অংশের নাম সহজিয়া বৈষ্ণব। এদের নানা আচরণগত পার্থক্য থেকে উপসম্প্রদায় বা স্রোত গড়ে উঠেছে। যেমন পাটুলিস্রোত, বীরভদ্রের স্রোত, নিত্যানন্দের স্রোত, রূপ কবিরাজের স্রোত ইত্যাদি। সতর্ক পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় কালকূট গোপীদাসের আশ্রমে যাদের দেখেছেন সেই গোপীদাস, রাধা, গোকুল, বিন্দু এরা সকলেই আসলে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কোনো একটি স্রোতের সদস্য। সেকথা স্পষ্ট হয়

যখন তারা বলে পঞ্চতত্ত্ব সাধনার কথা। প্রসঙ্গক্রমে গোপীদাসের একটি সংলাপ এখানে উদ্ধারযোগ্য,

> যেমন তেমন গুরু লয় বাবাজি, পরমগুরু। সহজে পাঁচরসিক। রসিক সবাই হয়না। বাউল কয়, ভবেতে আছেন পাঁচরসিক, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আর শ্যাখর রায়।

পঞ্চ রসিকের এই উল্লেখ থেকেই বোঝা যায় গোপীদাসের আখড়া আসলে বাউলের আখড়া নয়, সহজিয়া বৈষ্ণবের আখড়া। কিন্তু কালকূট তো *কোথায় পাবো তারে* উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে বাউলদের কথাই বলতে চেয়েছেন, 'কোথায় পাবো তারে' গানের এই তীব্র খোঁজার আর্তিও তো বাউলদেরই। যখন অন্য সম্প্রদায়দের দিয়ে কালকূট আমাদের কাছে পৌঁছাতে চান তখন সেই প্রার্থিত আর্তিটুকু আসে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে কখনও কখনও তত্ত্ববর্ণনার টানে কালকূট এমন কিছু গান ব্যবহার করেন যা রসাভাস ঘটায়। যেমন *কোথায় পাবো তারে* উপন্যাসে গোপীদাস বলে,

> জাইনবে বাউলের কোনো জাত নাই। মানুষের কোনো জাত নাই। সিকথা বইলছেন রসিক চণ্ডীদাসে। আর জপ-তপ-মন্তর তন্তর, তাও বাউলের না। দ্যাখ নাই কেনে তপ্‌পোন করে করে, বলে, স্বগ্‌গে পিত্‌রিপুরুষকে জল দেয়। ই হবার লয় বাবাজি। বাউলের গান আছে,
>
> বামুন বলে তপ্‌পোনে জল স্বগ্‌গেতে যায়।
> হায় অনাবিষ্টির মাঠে চাষা কাঁদে হে
> ঠাকুর তোমার তপ্‌পোনের জল হোথা কেনে না যায়!

গোপীদাসের সংলাপের সাহায্যে না হয় কালকূট তাঁর মনের কথাটি সাজিয়ে বলেন। উপন্যাসে তা হতেই পারে। কিন্তু বাউলগান বলে তিনি যে গীতাংশটি ব্যবহার করেছেন তা তো কোনোভাবেই বাউলগান নয়। সেটি সুনিশ্চিত ভাবেই কালকূটেরই রচনা। এর ফলে বাউলদের সম্বন্ধে তত্ত্বগত ও বিশ্বাসগত একটি ভুল বনিয়াদ তৈরি হয় যা লেখকের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে।

কালকূটের লোকায়তিক এই ধরনের রচনাগুলিতে সত্য-ভ্রষ্টতার ও ধারণাগত ধূসরতার আরও বেদনাদায়ক নমুনা আছে। যেমন *অমাবস্যায় চাঁদের উদয়* উপন্যাসে পবিত্রী মা কালকূটকে বলেন,

> তত্ত্বটা জানা থাকা চাই, জানলেই হাওয়াগড়ি চলে। তেমনি ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডরও একটা তত্ত্ব আছে। এই ভাণ্ডই যে ব্রহ্মাণ্ড তা বোঝাবার একটা তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্ব যে সাধে সে তা বুঝতে পারে।

কোথায় পাবো তারে উপন্যাসে গোপীদাস বলে,

> বাউলের মোদ্দা কথাটো শুইনছ ত, যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই বেস্তাণ্ডে। অই গ বাবাজি, উটি হল আসল কথা।

একই উপন্যাসের গাজী কালকূটকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলে—'এই ঘরে এই ভাণ্ডে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদের তত্ত্ব কালকূটের উপন্যাসে সকলেই বলে। এর প্রথম বক্তা পবিত্রী মা হলেন শাক্ত তন্ত্রের উন্নত স্তরের সাধিকা। দ্বিতীয় বক্তা গোপীদাস একজন প্রবর্তক স্তরের সহজিয়া বৈষ্ণব। আর তৃতীয় বক্তা গাজী একজন সাধারণ ভিখারি। এরা তিনজনই অবস্থানগত দিক থেকে একেবারে তিনটি স্বতন্ত্র স্তরের মানুষ। এদের মধ্যে পবিত্রী মা সত্যিকারের সিদ্ধের সিদ্ধা সাধিকা। কাজেই তাঁর মুখে ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ যতটা সত্যোপলব্ধি নিয়ে ফুটে ওঠে ততটাই কি ফুটতে পারে গোপীদাসের উপলব্ধিতে যে ভ্রষ্ট বাউল (তার নিজের ভাষায় 'বইলছি কি বাবাজি আমি বাউল না। আমরা কেউ বাউল না।. . .তা, আমরা হলাম পতিত'।) অথবা মুর্শিদের নামে মজদুরি করা ছদ্মধার্মিক গাজীর কণ্ঠে?

কাজেই কালকূটের এই বর্গের রচনাগুলি পড়তে গিয়ে আমাদের কেবলই অস্বস্তিতে পড়তে হয়। আমরা বুঝতে পারি না তিনি কাদের দিয়ে কোন তত্ত্ব বলাচ্ছেন বা কেন বলাচ্ছেন। যেমন *অমাবস্যায় চাঁদের উদয়* উপন্যাসে পবিত্রী মা কালকূটকে বলেছেন—

> আপন সাধনকথা / না কহিবে যথাতথা। তা জানেন শুধু গুরু, ...

আর জানেন তিনি, যিনি সাধনসঙ্গী, যিনি কৌলশক্তির পূজা করেন।

কোনো শাক্ততান্ত্রিক সাধিকা আপন সাধনকথা / না কহিবে যথাতথা এই উক্তিটি কালকূটকে করতে পারেন না, কারণ এই নিষেধ বাক্যটি তান্ত্রিকদের নয়, বাউলদের। প্রসঙ্গক্রমে দ্রষ্টব্য ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় বইটি।

কোথায় পাবো তারে উপন্যাসে কালকূট এমন কিছু স্বাধিকারপ্রমত্ততার পরিচয় রেখেছেন যা তিনি নিছক ঔপন্যাসিক বলে মার্জনা নাও পেতে পারে। যেমন বসিরহাটের মামুদ গাজী নামে এক ভিক্ষাজীবীর কণ্ঠে লালন ফকিরের অনেকগুলি মারফতি গান ব্যবহার করেছেন যা অমন অনায়াসে ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে গাইবার রীতি নেই। এখানে প্রসঙ্গত মারফতি গানের তত্ত্ব তালাস বিষয়ে দু-একটি কথা বলে নিলে পাঠকদের সুবিধা হবে এবং রসজ্ঞদের অসুবিধার দিকটা তাঁরা অনুধাবন করতে পারবেন।

কথাটা এই যে, বাউলগান ও মারফতি 'শব্দগান' কোনো নিছক বিনোদনের গান নয়। শ্রোতাদের খুশি করার জন্য এসব গান কখনও গাওয়া হয় না। বিশেষ কোনো আসর বা জমায়েতে মরমি শ্রোতাদের সামনে সাধারণত দুইজন গাহক লৌকিক ধর্মাচারের বা তত্ত্বের কোনো গোপন বা জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার দায়ে বিশেষ নির্বাচিত কয়েকটি গান গায় অনেকটা প্রশ্নোত্তরের মতো। শেষ পর্যন্ত একটি তত্ত্বনিরসনকারী গানে আসর শেষ হয়। এসব ক্ষেত্রে গায়ক মানেই সাধক মরমি ও তত্ত্বজ্ঞ! এইসব তত্ত্বজ্ঞ সাধক সর্বশ্রেষ্ঠ ও চরম তাত্ত্বিক গান হিসাবে বেছে নেন পাঞ্জু শাহ, হাউড়ে গোঁসাই, পদ্মলোচন, এবং সবশেষে লালন ফকিরের গান। বাউল গানের তাত্ত্বিক জগতে লালনগীতির ভূমিকা ও মর্যাদা বাংলা গানে রবীন্দ্রসংগীতের মতো। তা খুব কমজনই গাইতে পারে, বিশেষত তত্ত্ব জেনে গাইতে পারে। কাজেই কালকূট *কোথায় পাবো তারে* উপন্যাসে উঞ্ছজীবী মামুদ গাজীর কণ্ঠে যখন তত্ত্বময় লালনগীতি ভরে দেন তখন রসজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে অস্বস্তির শেষ থাকে না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে লেখক মামুদ গাজীর কণ্ঠে লালনগীতির বিকৃত বাণী

সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। গানটি হল, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'। মামুদ গাজীর কণ্ঠে এই গান কালকূট রূপান্তরিত করেছেন এই উচ্চারণে যে 'সবলোকে কয়, তুমি কী জাত সংসারে।'

একটু স্থিতধী বিবেচনাতেই বোঝা যায় যে মূল গানটি লালনের আত্ম-জিজ্ঞাসার গান। সম্ভবত তাঁর জীবিতকালেই লালনের জাতিতত্ত্ব নিয়ে সংশয় ও বিতর্ক জেগেছিল। জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ বাউল লালন তার সমাধান করেছিলেন এই বলে—

সবলোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।

কালকূট মামুদ গাজীর কণ্ঠে গানটিকে বিকৃতরূপে দাঁড় করিয়েছেন এইভাবে যে—

সবলোকে কয়, তুমি কী জাত সংসারে।
আমি কই, জেতের কী রূপ দেখলাম না নজরে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই অতি প্রসিদ্ধ লালনগীতির ভণিতা পর্যন্ত কালকূট উল্লেখ করেননি। কিন্তু সঠিক অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি জানতেন যে কোনো মরমি গায়ক ভণিতা ছাড়া গান করাকে অপরাধ বলেই জানেন এবং সজ্ঞানে কেউ পূর্বজ কোনো ভাবসাধকের গানের (তাঁদের ভাষায় 'মহতের পদ') একটি শব্দও বদলানোকে অপরাধ জ্ঞান করে।

কাজেই এখানে প্রশ্ন ওঠে দুটি। প্রথমত, জানতে ইচ্ছে করে এই গান কালকূট কেন বিকৃত করেন, তাতে উপন্যাসের কোন্ সিদ্ধি ঘটে? দ্বিতীয়ত, জানতে ইচ্ছে করে মামুদ গাজী কোথা থেকে পায় 'মহতের পদ' নিয়ে এমন স্বৈর ব্যবহারের স্পর্ধা? প্রশ্ন এই জন্যই যে মামুদ গাজী চরিত্রটি বরাবরই বিনয়ী এবং নম্র। কাজেই তার কথা ও তার গানে যে বৈপরীত্য জেগে ওঠে তাতে চরিত্রটি সঠিক প্রতিষ্ঠা পায় না।

আসলে কালকূট নিজেও কি চেয়েছেন চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা দিতে? তা যে চাননি তার প্রমাণ মামুদ গাজীর সঙ্গে লেখকের বিদায় নেবার সময়ের কথাবার্তায় ধরা পড়ে। লেখক সুদীর্ঘক্ষণ, প্রায় দু দিন, গাজীর সঙ্গে কাটিয়ে তার মরমি তত্ত্বব্যাখ্যা ও গান শোনার পর সবশেষে জানতে

পারেন যে গাজী আসলে গাজী নয়। 'সে সংসারে খুঁটে খাওয়া কোটি এক।... যেন লড়িয়ে বাবা, সন্তানের স্নেহে করুণ। বিবির প্রীতিতে প্রেম গদ্‌গদ। ঝোলা ডুপ্‌কি আলখাল্লা, সব নিয়ে এক বাংলা দেশের গায়ক, জীবধর্মে একেবারে সোজাসুজি মানুষ।'

তাই যদি হবে তাহলে এমন একটি চরিত্রের মুখে কেনই বা লেখক বসালেন তত্ত্ব, কেনই বা শোনালেন লালন ফকিরের নিগূঢ় গান? সেই তত্ত্ব বা গানের অর্জন তার কোথা থেকে হল? কোন পরম্পরা থেকে এমন মহৎ গানের ঐতিহ্য 'মুর্শিদের নামে মজদুরি' করা গরিব শিশোদরপরায়ণ গায়কের কণ্ঠে এল? এসব তত্ত্ব আর অসামান্য গান কি বসিরহাটের ধুলোয় পাওয়া যায়?

কাজেই কালকূটের বেশ কিছু চরিত্র ও তত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। যেমন *কোথায় পাবো তারে*'র দ্বিতীয় অর্ধে লেখক গোপীদাস-রাধা এবং গোকুল-বিন্দু আখড়াধারীর জীবনকে অবলম্বন করে বীরভূমের লৌকিক ধর্মের আর এক অঙ্গনে নিয়ে যান। এক্ষেত্রে অবশ্য এই বৈরাগি পরিবার ও কালকূটের মাঝখানে অচিনপাখির মতো একটি চরিত্র (যার নাম অচিনদা) আসে ও যায় এবং রেখে যায় মরমি এই সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু আলোক রেখা। বস্তুত *কোথায় পাবো তারে* উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধ খুবই সুলিখিত এবং গ্রাম্য লৌকিক সাধকদের সহজ সরল জীবনধর্মিতার তাপে উষ্ণ, রূপে রসে কোমল। কাহিনি-বিস্তারের একেবারে শেষে যখন আমরা এই সাধক মানুষগুলি সম্পর্কে সম্ভ্রম ও ভালোবাসায় নুয়ে পড়ি, লেখকের রূপ-সন্ধানের কুশলতায় তাঁকে বলিহারি দিই, ঠিক সেই সময় মোহ ভেঙে দেন লেখক। গোপীদাস নির্জনরাতে অনিদ্র কালকূটকে বলে

'বইলছি কি বাবাজি, আমি বাউল না। আমরা কেউ বাউল না।... আমরা হলাম পতিত।'

গোপীদাসের এই কথা শুনে লেখকের মনে হল,

'যেন এই গভীর অন্ধকারে এক বিশাল গহ্বর তার মধ্যে ডুবে যায়। আমার মনে পড়ে যায় দক্ষিণের দরিয়ার কূলে গাজীর কথা।'

তাহলে দেখা গেল মামুদ গাজী আর গোপীদাস এমন দুজন ফাঁকা ও ফাঁপা ভাবসাধককে সঙ্গী করে কালকূট তাঁর সুদীর্ঘ উপন্যাসে খুঁজে বেড়িয়েছেন *কোথায় পাবো তারে*। ভুল পথে বেঠিক সঙ্গীকে অবলম্বন করে কোনো প্রার্থিতকেই কি পাওয়া যায়?

কালকূটের লোকায়তিক পরিক্রমা তাই শেষ বিচারে নানা শাখা-উপশাখার বিস্তারে স্রোতাবর্ত এনেও সাগরে মেশেনা। তবু এই বর্গের লেখাগুলি চিনিয়ে দেয় তাঁর জাত। বুঝিয়ে দেয় অভিজ্ঞতার সামর্থ্য। আধুনিক কথাকারদের মধ্যে কালকূটের মতো আর কেউ যে লোকায়তের এমন সম্পন্ন ব্যবহার করতে পারেননি সে তথ্যটুকুও জরুরি। কালকূট রচনা সম্ভারের একটা বড়ো অংশ তাই মাটি-ছোঁওয়া মানুষের অংশ গ্রহণে সজীব ও প্রাণোচ্ছল। নানা ঠারেঠোরে, ছলাকলায় লোকজীবনের মানুষগুলি তাঁর রচনায় ধরা দিয়েছে। গানে গানে ভরে আছে তাঁর লোকায়ত জীবন বিবরণ। এসব রচনা বাংলা উপন্যাসে একটা বড়ো কাজ করেছে। সাহিত্যের হালফিল শীর্ষমুখিনতা বা elitism-কে খুব নাড়িয়ে দিয়েছে।

অলীক মানুষ : লোকায়তের মিথ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছিলেন এখনকার কালের একজন কলিকাতাবাসী লেখক, যাঁর সন্ধিৎসু জ্ঞানচর্চার নানারকম নমুনা পাওয়া যেত নানা চিঠির জবানিতে। হয় নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কিংবা অন্যের তথ্য বা যুক্তির ফাঁক দেখাতে তিনি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে প্রায়ই চিঠি লিখতেন। তা পড়ে, তাঁর বক্তব্য মানি বা না মানি, মানুষটির বিদ্যাবত্তা ও বহুতর পঠন-পাঠনের ব্যাপারটি স্পষ্ট হত ও সম্ভ্রম উদ্রেক করত। অথচ সিরাজের সদাজাগ্রত নাগরিক চৈতন্যের ভেতর ভেতর বয়ে চলেছে তাঁর দীর্ঘযাপিত গ্রামীণ জীবনের অন্তঃস্রোত, তার স্মৃতিপুঞ্জ ও লোকায়ত ভাবে আমরা অনেকেই জানি সিরাজের বুকের ভেতর সর্বদা সজীব হয়ে আছে অন্তঃশীল গ্রামজীবনের যাপনগত উষ্ণ স্মৃতি। স্মৃতি কেন? বোধহয় ভুল লিখলাম, স্মৃতি নয়, কারণ গ্রাম—বিশেষত নদে-মুর্শিদাবাদ-মালদহ ঘেঁষা, রাজশাহী ছোঁয়া, তাঁর রোমন্থনের বিষয় নয়—সজীব নিত্যদিনের চর্চার বিষয়। মাঝে মাঝেই যেতেন নিজের বাস্তুগ্রামে বসবাসের টানে। তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক তাঁর মরদেহ নিজের ভিটেতেই কবর দেওয়া হয়েছে। জন্মগতভাবে ধর্মত মুসলমান তিনি, সৈয়দবংশীয় খান্দানে সমারূঢ়, কিন্তু ব্যাপক জ্ঞানচর্চা, বিপুল জীবনবোধ এবং সম্ভবত বিস্তারিত লোকায়ত অভিজ্ঞতার পাঠ তাঁকে করে তুলেছে ধর্মনির্লিপ্ত কিন্তু বিচারশীল। সেইজন্য 'বাহাস' বা বিতর্কে তাঁর ঘোরতর উৎসাহ। বাঁধিবোল বা সর্বজনীন ভুলধারণার বিরুদ্ধে তিনি সদাসর্বদা উদ্যতশস্ত্র। বলাবাহুল্য, তাঁর শস্ত্র হল লেখনী এবং সেই শরসন্ধানের পিছনে আছে যাপিত জীবনের অভিমান ও বহুদর্শিতা। সেই জন্যই *অলীক মানুষ* উপন্যাসের এক জায়গায় সিরাজ লেখেন; দেবনারায়ণের জবানিতে :

মুসলমান ধর্মে যার জন্ম, তার তিনটে মূল কালচার। ইসলামি কালচার, পারিপার্শ্বিকগত হিন্দু কালচার আর শিক্ষাসূত্রে লব্ধ পাশ্চাত্য আধুনিক কালচার।

সিরাজের *অলীক মানুষ* উপন্যাসের আসল 'টেক্সট' অন্তত আমি যতদূর বুঝেছি, এইটাই। তাই তাঁর চোখে ধরা পড়ে মুসলমান ও হিন্দু সমাজের কয়েকটি অনপনেয় বৈপরীত্য। যেমন উপন্যাসের গ্রামীণ বাতাবরণে সিরাজ দেখান, ময়রা হরিনাথ সমাদর সহকারে অভিজাত ও ইংরাজি শিক্ষিত বারি চৌধুরীকে দোকানে বসিয়ে বাক্যে আচরণে প্রভূত বিনয় ব্যবহার করে কিন্তু হিন্দুর স্বাজাত্যাভিমানে মিষ্টি ছুঁড়ে দেয় ঠোঙায় করে ওপর থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে। অথচ দেওয়ান প্রফুল্লরতন সিংহ অভিজাত হিন্দু হয়েও পানীয় জল নিজের হাতে করে তুলে দেন শফির হাতে।

কেন এমন দ্বিমুখী আচরণ? প্রফুল্লরতনের জগৎ যে-অর্থে শিক্ষিত ও উদার তার পুণ্যস্পর্শ কেন হরিনাথ ময়রাকে ছোঁয় না এ প্রশ্নের উত্তর এদেশে পাঁচশো বছর ধরে অমীমাংসিত। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভ্রান্তি বাঙালি-সমাজে এতটাই ওতপ্রোত যে কোনো যুক্তি তর্ক দিয়ে এর মীমাংসা নেই। বিচিত্র আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বাসের ধরন, বিচিত্রতর আচরণবাদ। *অলীক মানুষ* উপন্যাসে আরও দেখা যায় :

> একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এই নরসুন্দর বা হিন্দু নাপিতরা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সদগোপ-গোপ প্রমুখ জাতির ক্ষৌরকর্ম যেমন করে, তেমনি মুসলমানদের ক্ষৌরকর্মেও তাদের আপত্তি নেই। ...কিন্তু তারা কদাচ বাগদি কুনাই কুড়র হাড়ি-মুচি-ডোম প্রমুখ নিম্নবর্গীয়দের ক্ষৌরকর্ম করবে না।

দ্বন্দ্বে-বৈপরীত্যে বিন্যস্ত এমন আপাত অলীক জগতে সিরাজ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন এবং তৈরি করেন এক অভিনব টেক্সট, যার বিচার বিশ্লেষণে অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গি দরকার।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একজন ভিন্নস্বাদের কথাসাহিত্যিক। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খোসবাসপুর নামের একটি সামান্য গ্রামে তাঁর জন্ম এবং রাঢ়ের জনপদ জীবনের মধ্যে যাকে বলে বাগড়ি অঞ্চল—তার

বাগ্‌বিধি, আচরণ, লৌকিক উৎসব-বিশ্বাস-বিনোদনসহ সেখানকার মানুষের জীবননির্বাহের প্রাত্যহিক তাঁর জানা এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি ছিলেন সেই জনবৃত্তের শরিক। সেই কারণেই তাঁর সারস্বত সাধনায় বিষয়গত নতুনত্ব এবং আকাঁড়া বাস্তবের প্রতিচ্ছবি গঠনে খুব শ্রম করতে হয়নি। নাগরিক লেখকদের মতো মনোবিকলননির্ভরতা বা আঁতিপাঁতি করে কাহিনি-বিষয় খোঁজার আকুলতা সিরাজকে বিভ্রান্ত করেনি। তিনি ধীর ও স্বভাবনিষ্ঠ লেখক, বিপুল ও বিপরীত অভিজ্ঞতায় স্নাত, প্রধানত গ্রামীণ জীবনের কথাকার, যার স্ফুরণ দ্বিমুখী—ছোটগল্প ও উপন্যাস।

সিরাজের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আরো দুটি বিশিষ্ট দিক জানা থাকলে তাঁর রচনা সাম্রাজ্যে প্রবেশ সহজতর হয়। প্রথম তথ্য এই যে, নিজের আঞ্চলিক লোকজীবনে তাঁর অধিকার অবাধ ও বহুমুখী। একথা এখন সবার জানা যে তিনি একজন গ্রামীণ শিল্পী বা পারফরমার ছিলেন। আলকাপ দলের সক্রিয় সদস্যরূপে একদা লোকশিল্পের বুনোট সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান এবং গ্রামীণ দর্শক-শ্রোতাদের নিজস্ব রুচি-মর্জি সম্পর্কে তিনি সতর্ক। যেহেতু, আলকাপ গানের বা নাচের ধরনটি দলীয় এবং তার চলাচল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, তাই বহতা জীবন ও জনপদের ছন্দ তাঁকেও গ্রাস করেছে। মানুষটি সচল ও পরিপার্শ্ব-সচেতন, সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় একটি প্যারাম্বুলেটিং কালচারের অংশীভূত। অর্থাৎ যেন নিজের মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছেন লোকায়ত সজীব শিল্পের ধারা। তারাশঙ্করের *কবি* উপন্যাস রচনাতে যেমন লেখককে নিতে হয়েছিল দ্রষ্টার ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা, সিরাজের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তাঁর ভূমিকা অব্যবহিত, তিনি একসঙ্গে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। গান তাঁকে কল্পনা করে রচনা করতে হয়নি, পেয়েছেন শ্রুতি-পরম্পরায়, তার থেকে নবরূপ গেঁথেছেন। *মায়ামৃদঙ্গ* উপন্যাসে সিরাজের আলকাপ-জীবনের দিনযাপন ও লৌকিক অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর মিশ্রণ আছে, সেটা সবাই মানেন। সিরাজ সম্পর্কে দ্বিতীয় তথ্য এই যে, প্রথাবদ্ধ ও পাঠক্রমকেন্দ্রিক পড়াশুনায় তাঁর ঝোঁক কম—স্বনির্বাচিত জ্ঞানের নানা এলাকা তাই মানুষটির পাঠপ্রবণতায় ধরা পড়েছে। জ্ঞানার্জনের কোনো সীমা নেই,

এলাকা বিভাজনও নেই—সে কারণে ধর্ম-সমাজবিদ্যা-নৃতত্ত্ব-সংস্কৃতি-ভাষা তত্ত্ব ও সাহিত্যের নানা দরজায় সিরাজ টোকা মেরেছেন নিজের মতো করে। বেশ কয়েকটি ভাষা ও তার ব্যাকরণ তাঁর আয়ত্ত। তিনি কোনো অর্থেই গুরুমারা বিদ্যায় বিশ্বাসী নন। নিজের রুচি, জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল মেনে তাঁর জ্ঞানান্বেষণ, ফলে সিরাজের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ সমসাময়িকদের পক্ষে ঈর্ষাযোগ্য। তাঁর জ্ঞানের ঝলক মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসে দৃষ্ট চরিত্রের সংলাপে, সব সময় তা প্রাসঙ্গিক থাকে না, যেমন *অলীক মানুষ* উপন্যাসে গোবিন্দরায় সিংহ বলেন :

> মুসলমান মতে যা কালো জিন, খ্রিস্টানি মতে তা স্যাটান, বৌদ্ধমতে তা মার, জরথুষ্ট্র মতে তা আহিরমান এবং হিন্দু মতে তা অশুভ প্রেতশক্তি।

এমনই সংলাপের টানে সিরাজ বুনে দেন তাঁর তত্ত্ববিশ্বের নানা প্রতিপাদন ও সিদ্ধান্ত, যেমন তাঁর একটি ধারণা হল : Islam is the drastic form of Christianity। সে যাইহোক, মূলকথা হল, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তথাকথিত সাহিত্যকার নন, তিনি মেধাবী ও জ্ঞানী। সেই জ্ঞান যেমন পুঁথিলব্ধ তেমনই জীবনের পাঠে রমণীয়—লোকলৌকিকের স্পর্শে অনেকটাই মৃত্তিকাস্পর্শী।

এত বড় ভূমিকা করে তবে আমরা *অলীক মানুষ* পাঠে এগোতে পারি এবং তার সূচনাতে আরও দুটি তথ্য এসে পড়ে। প্রথমত, এ রচনায় ইসলাম অধ্যুষিত এক বলয়িত সমাজের লোকায়ত ভাষ্য পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত এটি তাঁর প্রবীণ বয়সের রচনা। যথেষ্ট পোড়খাওয়া বয়সের অভিজ্ঞতার আঁচ এর কাহিনি বয়নে রয়েছে এবং আখ্যান রচনার সচেষ্ট মুন্সিয়ানা বারেবারে চোখ টানে। ষাট পেরনো বয়সে *অলীক মানুষ* লিখতে গিয়ে তিনি পড়েছিলেন আঙ্গিকগত সমস্যায়—তার সমাধানও করেছেন নিজের মতো করে, উত্তর-আধুনিক ধারায়। বইয়ের জ্যাকেটে ঘোষিত কথাগুলি (যা সম্ভবত লেখকেরই রচনা) প্রথমে পড়ে নেওয়া যাক :

> দীর্ঘ প্রায় একশো বছরের কাহিনি বস্তুত উপস্থাপিত হয়েছে কোলাজ রীতিতে। কখনও সিধে ন্যারেটিভ, কখনও মিথ ও

কিংবদন্তী, আবার কখনও ব্যক্তিগত ডায়েরি, সংবাদপত্রের কাটিং মিলিয়ে মিশিয়ে দূর-ধূসর এক সময় এবং বিস্ময়কর কিছু মানুষের বৃত্তান্ত। কিন্তু সব মিলিয়ে আভাসিত হয়েছে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম জীবনের এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত একটি সত্যিকার ঐতিহাসিক সনদ।

যদি ধরে নিই জ্যাকেটে মুদ্রিত এই ভাষ্য লেখকের আত্মপক্ষ তবে তো গোল মিটেই গেল। ন্যারেটোলজি বা আখ্যানতত্ত্বের অনেক ভাঁজ থাকে, বিশেষত প্রতীচ্যে। সেখানকার আখ্যানতত্ত্ব হয়ে উঠতে চায় বহুবিদ্যার সম্পুট। তাই তাতে কাহিনির দুর্নিবার একমুখী গতি ও বিন্যাসের পৌর্বাপর্য বড় হয়ে ওঠে না, থাকে না গ্রন্থনার সুষমা। এখানেও যেন সিরাজ তাই ঘটাতে চেয়েছেন। তাই জ্যাকেটের আরেকটি ঘোষণাও দ্যোতনাময় হয়, যখন পড়ি,

বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাস একেবারেই অনন্য সাধারণ— সব অর্থেই ট্রাডিশন-বহির্ভূত। লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম- অপ্রেম, মায়া-বাস্তবতার পরস্পর-বিপরীত গতির মাঝখানে সংগ্রামরত মানুষ কীভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয় এবং কীভাবে সেই মানুষ মিথের বিষয় হয়ে ওঠে, এমন কুশলতায় আর কখনও বর্ণিত হয়নি।

পরম্পরাহীন এই উপন্যাস হয়ত অভিনব, অনন্যসাধারণ নাই-বা হল, কিন্তু নিরীক্ষাবহুল। লৌকিক-অলৌকিককে মেলাতে গেলে ম্যাজিক রিয়ালিজমের ছক তো নিতেই হবে কাহিনিকারকে। সিরাজের লেখনীতে যেটা বাড়তি পাওয়া তা হল খাঁটি ইসলামিয়া জীবনের বস্তুগত ব্যাপক পটভূমি।

উপন্যাসের তিনটি প্রধান ভাবনা আস্তিক্যবোধ, নাস্তিকতা বা ধর্মনির্লিপ্ততা এবং প্রাকৃতিকতা। বারি চৌধুরী নামে মুক্তবুদ্ধির একজন মুসলমান উপন্যাসের নায়ক শফিকে বোঝান :

আমার ওসব পীরবুজুর্গে বিশ্বাস নেই। তুমি নাস্তিক মানে বোঝো? ...নাস্তিক মানে যার আল্লাখোদায় বিশ্বাস নেই। আমি তোমাদের ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। আল্লাখোদা বলে কোথাও কিছু নেই। মানুষ হল নেচারের সৃষ্টি। নেচার মানে বোঝো তো?

এসব কথা যাঁর মুখনিঃসৃত তাঁর মধ্যে মিশেছে তিনটি সংস্কৃতির টানাপোড়েন। জন্মগত ইসলামি সংস্কার, পরিপার্শ্বের হিন্দু ভাবধারা এবং পুঁথিপড়া ইংলিশ কালচার, যা আমাদের ঔপনিবেশিক অর্জন। এই তিনের স্রোতোধারার আমূল সংসর্গে যাঁদের বেড়ে-ওঠা তাঁদের দর্শন তো গড়পড়তা ভাবনার সঙ্গে মিলতে পারে না। তাই উপন্যাসের আখ্যান বৃত্তে এমন তে-আঁশলা চরিত্র চৌধুরী আবদুল বারি কিংবা গাজি সইদুর রহমান খানিকটা বিচ্ছিন্ন থেকে যান। তরুণ নায়ককে তাঁরা নিজেদের আদলেও আনতে পারেন না। সে হয়ে যায় নির্বিকার ঘাতক, নিজেকেই সে মারে।

অলীক মানুষ পড়ার প্রবেশক হিসাবে বাঙালি সমাজের চলতি কাঠামোর হিন্দু-মুসলমান জাতিবিন্যাসের ছকটা ভালো করে জানা দরকার। পাঁচশো বছরের বেশি একসঙ্গে বসবাস করেও এদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক লেনদেন তেমন সুস্থভাবে হয়নি। তার একটা কারণ ধর্মের ধরন, আরেকটা কারণ উর্দু ও আরবি শব্দ, আরেকটি কারণ দু' পক্ষের খাদ্যাভ্যাসের আলাদা রকমসকম। এ সবই অবশ্য অপ্রধান হয়ে যায় গরিব-গুর্বোদের গ্রাম্য বাতাবরণে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সব সীমারেখা, সব বিধিনিষেধ ভেঙে দেয়। তাই দেখি বাউলের গানে ইসলামি অনুষঙ্গ রয়ে গেছে, দেখি মুসলমান কবি লিখছেন বৈষ্ণব ও শাক্ত গান। বন্যা এসে যেমন করে গ্রামের সব বাড়ি গ্রাস করে, ভেদ করে না জাতি বা ধর্মের, তেমনি ভাবের বন্যা এসে সবাইকে ভাসিয়ে দেয়। তখন লৌকিক গীতিকার লিখে বসেন, 'রাধাকৃষ্ণ মহম্মদ একাঙ্গ একাত্মা সার।' এমনও লেখেন, 'আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।' হিন্দু গীতিকার চরম দারিদ্র্য দুঃখে লেখেন 'চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি?' মুসলমান গীতিকার দারিদ্র্যের খেদে উল্লেখ করেন 'নামাজ আমার হইল না আদায়'! অভাবের তাড়নাতেই গরিব মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম পালন করতে পারে না। ধর্মের আচরণবাদের সঙ্গে নিজের অহর্নিশি খাটনিকে সে মেলাতে পারে না। কোন্‌টা আগে? ভগবানকে ডাকা অথবা উদরান্নের ব্যবস্থা করা?

এ গেল একটা দিক, আরেকটা দিক হল এই ঐতিহাসিক সত্য যে বাঙালি হিন্দু সমাজের মানুষজনই এককালে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। সেই কারণে মূল জাতিগত সংস্কারের স্মৃতি কখনই মোছে না। তার ফলে পৌত্তলিকতা (বুত-পরোস্তি) যা ইসলামবিরোধী তা মুসলিম নিম্নবর্গে থেকে গেছে। তাছাড়া মধ্যযুগের পরে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বাদীরা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের কল্পনা করেছিলেন, যাতে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল।

ইসলামি সমাজ ভাবনায় শ্রেণিবর্ণভেদ থাকার কথা নয়, জাতিভেদের প্রশ্ন সেখানে আসা সংগত নয়। তবু তা আছে। 'আশরাফ'-'আতরাফ' নামে দুটি বড় বিভাজন তো আছেই, তারপরেও আছে 'আজলাফ', এমনকী খুব নিম্নবর্গের মুসলমানদের বলে 'অর্জল' (জোলা নিকিরি কাহার বর্গ)। অলীক মানুষেও এই বিভাজন সম্পর্কে সিরাজ সচেতন। চৌধুরী আবদুল বারি কিংবা গাজি সহদুর রহমান শুধু ইংরিজিশিক্ষিত তাই নয়, এঁরা উচ্চবর্গেরও। এঁদের খান্দান ও সম্ভ্রমপূর্ণ ভূমিকার পাশে একফালি নদীতে নৌকার দাঁড় হাতে অশিক্ষিত মেয়েমানুষ আসমার নির্লজ্জ শরীর প্রদর্শন এবং নায়ক শফি-র (যে কট্টর ফরাজি ধর্মনেতার সন্তান) আসমা-র প্রাকৃত শরীরে অসহায় নিমজ্জন ও পরে চরম আত্মগ্লানি লক্ষ্য করবার মতো।

কাহিনির নায়ক শফির অগ্রজ নুরুজ্জামান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামিয়ায় শামিল হয়ে ধর্মবিষয়ে পাঠ সাঙ্গ করে 'ফাজিল' (ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ ছাপ) হয়ে যখন গ্রামে ফিরল তখন তার বর্ণনা : 'ঝকঝকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে কালো দাড়ি। মাথায় ফেজ টুপি। পরনে ঘিয়ে রঙের আচকান। পায়ে নাগরা জুতো।' কিন্তু এই বাহ্য রূপান্তরের চেয়ে যেটা ঘটে যায় তা হল নুরুজ্জামানের ভাষার বয়ান পরিবর্তন। নুরু তার ছোট ভাই শফিকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তু কিতনা বাঢ় গিয়া, শফি? তুমকো হাম পছানতাভি নেহি? ... তো শফি, তোর চেহারায় হিঁদুর ছাপ পড়েছে। তুই কি ইস্কুলে ধোতি উতি পিঁধিস, নাকি পায়জামা-কুর্তা পিঁধিস?' চেহারার মধ্যে হিন্দু-মুসলিমের তারতম্য প্রসঙ্গ আরেকবার পাই

তারক নাপিতের সংলাপে। সে বলে : 'মিয়াসাহেব। আপনি বড় খাসির মাংস (গোমাংস) খাওয়া ছেড়েছেন বলেই আপনার রূপ খুলেছে। হ্যাঁ, কোন্ গুখেকোর বেটা বলে যে আপনি মুসলমান?'

অলীক মানুষ থেকে এমন ভূরি ভূরি নমুনা হাজির করা যায়, যার থেকে নিষ্পন্ন হয় যে, একশো বছর ধরে (লেখকের মতে উনিশ-বিশ শতকের পটভূমিতে) আমাদের গ্রামীণ সমাজ জীবনে, মুসলমান অধ্যুষিত পরিবারগুলিতে লৌকিক-অলৌকিকের দ্বান্দ্বিক বিন্যাসটি বেশ অনড়। তাদের জীবনে ও বিশ্বাসে নানা বিধিনিয়ম, ধর্মীয় দোলাচল ও অশিক্ষাঘটিত অজ্ঞতা রয়ে গিয়েছিল। ইংরাজদের শাসন-শোষণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ব্রাহ্ম আন্দোলন মূল ইসলামি গ্রামবিন্যাসে খুব একটা হেলদোল আনেনি। বারি চৌধুরীদের মতো দু'চারজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তি ইংরাজি শিক্ষা নিয়ে ভিন্নতর ভাবনা করছিলেন কিন্তু তার ফলাফল অন্তত এ-উপন্যাসের আখ্যানবৃত্তকে টলাতে পারেনি। লক্ষণীয় যে ব্যতিক্রমী মুসলমান চরিত্রগুলির লেনদেন রয়েছে হিন্দু মানুষদের ভাবনার সঙ্গে, ব্রহ্মউপাসকদের সঙ্গে, নগরের সঙ্গে। তাঁদের আত্মীয় বর্গের বাড়িতে, যারা গ্রামবাসী ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, যাতায়াত আছে কিন্তু বসবাস নেই। তাঁরা নগরবাসী এবং জীবিকাশ্রয়ী উচ্চ মধ্যবিত্ত বলেই গ্রামীণ সমাজ তাঁদের প্রত্যাঘাত করে না,—তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ছল তৈরি করতে পারেন, এমনকী আড়ম্বর করে নিজেকে নাস্তিক বলেন।

বারি চৌধুরী নামের এমনই এক চরিত্র, যিনি নবাবের দেওয়ান, *অলীক মানুষ* উপন্যাসের কাহিনির অনড় ইসলামি বিশ্বাস ও বদ্ধতার মধ্যে ঝড়ের বীজ ঢুকিয়ে দেন। মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ী ফরাজি এক প্রবীণ মুসলমান এই কাহিনির মুখ্য ভূমিকায়। তাঁর বড় ছেলে নুরু, ইসলামি বিদ্যায় 'ফাজিল' হয়ে গ্রামে ফিরে ধর্মের বা মসজিদকেন্দ্রিক উপাসনার নেতৃত্ব নেয়, মেজছেলে মনি প্রতিবন্ধী, আর ছোট ছেলে শফি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ড্রপ আউট। এই শফিকে তার বারিচাচা নিয়ে যান শহরে, তার পীর বুজুর্গ পিতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে

তাঁর নিজের মডেলের মুক্তমনা মুসলমান তথা নাস্তিক করতে। তাঁর পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত অবশ্য শফিকে তাঁর পথবর্তী করে না, তার কারণও ভিন্নতর, এবং শফি তার ব্যক্তিগত ভাবনার নানা টানাপোড়েনে, নানা বর্গের নারী সংসর্গে এবং নানা ব্যক্তির প্ররোচনায় নগরবাসী টেররিস্ট হয়ে যায়, হয়ে যায় হত্যাকারী আসামী, কারাগারে যায়। *অলীক মানুষ* উপন্যাসের সবচেয়ে বেটা চমকপ্রদ বিষয় তা হল অনভিপ্রেত ঘটনার সমারোহ। এখানে যেন বলার কথাটা এই, যে যা হতে চায় তা হতে পারে না। ফরাজি ধর্মগুরু সৈয়দ আবুল কাশেম মুহম্মদ বদি-উজ-জামান আল-হুসায়নি আল-খুরাসানি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে ইসলামের মূলতত্ত্ব ও পয়গম্বরের প্রকৃত বাণী প্রচার করে, গ্রামে গ্রামে পরিক্রমা করে, মসজিদবাসী হয়ে, পীরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও শেষপর্যন্ত মৃত্যুর পরে লোকের মুখে মুখে হয়ে যান 'বদুপীর'। অথচ এমনতর 'পীর পরোস্তি'-র বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর আজীবন লড়াই। ব্যাপারটি খুব দ্যোতক যে ধর্মগুরুর অতবড় একটা পোষাকি নাম, যেন তাঁর অনুপুঙ্খ ইসলামি আচরণবাদের মতো, ভেঙে গিয়ে দুই শব্দের বদুপীরের রূপ নিলো—এর চেয়ে বড় অলীকের লোকায়ন আর কি হতে পারে?

হিসাব করলে অবশ্য দেখা যাবে উপন্যাসে অলীক মানুষ এই একজনই নন, আরেকজন আছে, সে তাঁর ছোট ছেলে শফিউজ্জামান বা শফি। সে তার সংক্ষিপ্ত নামের মতোই একমুখী জীবনবিশ্বাসে উজ্জীবিত হতে চেয়ে, প্রাকৃতিকতায় মজে, প্রাকৃত নারীর দেহসংসর্গের করুণ স্মৃতি বয়ে, আরেক প্রার্থিতা রুকু বা দিলরুখকে না পেয়ে, সারাজীবন উন্মাদের মতো দিশাহারা। আত্মপক্ষের কোনো মীমাংসা করতে না পেরে সে হননকার্যে মেতে যায় এবং মরণোত্তর কালে সে-ও হয়ে যায় অন্যদের চোখে অলীক মানুষ বা মিথ। বদুপীর আর শফি দুজনেই লোকবিশ্বাসে পুনর্নির্মাণ পান, হয়ে পড়েন মিথক্রিয়ার অংশ।

অথচ এতসব না হতেও পারত। শফির ফরাজি পিতার মডেল গ্রহণ করলে, এমনকি না করলেও, সে পেয়ে যেত এক সচ্ছল জীবন, কারণ ধর্মগুরুরা কখনও দরিদ্র হন না, মুমুক্ষু মানুষ সর্বদাই নিজেদের অকাতর

দানে ভরিয়ে রাখে তাদের ধর্মপথের নেতার ভাঁড়ার। বাবা মা-র মনোনীত দিলরুখ বা রুকুর সঙ্গে (যাকে তার পছন্দ ছিল) তার বিবাহও হতে পারত এবং রূপকথার অন্তিম বর্ণনা তাদের দাম্পত্য সম্পর্কেও উচ্চারিত হতে পারত অর্থাৎ 'ইহার পরে তাহারা সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।' কিন্তু শফির ভাগ্যরেখা অন্যরকম। তাই আত্মীয়তা সূত্রে বারিচাচা তাদের বাড়ি এসে শফির ভাবী বিবাহের সম্ভাব্যতা ও গতানুগতিক জীবনস্বপ্নে ছেদ টেনে তাকে নিয়ে যান নগরজীবনের ব্যাপ্তি ও জটিলতায়, বহুচরিত্রসঙ্গমে ও ভাবাদর্শে। মৌলাহাট গ্রামের স্থবির জীবন থেকে ছিন্ন করে শফিকে কল্লোলে-কোলাহলে টানবার সময় বারিচাচার ভাষণটি উদ্ধৃতিযোগ্য। শফি শুনল,

> এ হতে পারে না শফি! তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে মুসলমানকে। তুমি নিশ্চয়ই স্যার সৈয়দ আহমদের কথা পাঠ্য বইতে পড়েছ। দেওবন্দ যেখানে তৈরি করছে ছদ্মবেশী ভিখিরির দল, সেখানে আলিগড় তৈরি করছে নয়া জমানার প্রতিনিধিদের। কেন ছদ্মবেশী ভিখিরি বলছি বুঝতে পারছিস তো শফি? তুই মৌলানাবাড়ির ছেলে। তুই বুদ্ধিমান। তোর বোঝা উচিত, এভাবে অন্যের দান হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকাটা মনুষ্যত্বের অবমাননা, নুরুজ্জামানকে আমি বুঝিয়েছি। তাকে বলেছি, এটা ইসলামের প্রকৃত পন্থা নয়। নুরুজ্জামান মহা তর্কবাগীশ হয়ে ফিরেছে। কথায়-কথায় সে কোরানহাদিশ কোট করে। কিন্তু এটুকু বোঝে না, মুরিদ (শিষ্য) দের ওটা ভক্তি নয়, আসলে দয়া। শফি, তোর আব্ববাও এটা হয়তো টের পান। তাই তোকে ইংরেজি ইস্কুলে পড়তে দিয়েছেন। তোর আব্বার মধ্যে বড্ড বেশি পরস্পর-বিরোধিতা। তিনিই বলেন, হিন্দুস্থান মুসলমানের 'দারুল হারাব', আবার তিনিই পয়গম্বরের কথা আওড়ান; 'উতলুবুলইল্‌মা আলাওকানা বিস্ সিন'। এলেম বা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন মুলুকে যেতে হলেও চলে যাও। না শফি, ... তোকে আমি আবিষ্কার করেছি—তোকে আমি হারাতে

চাই না। তোকে আমি নিয়ে পালিয়ে যাব লালবাগ শহরে। নবাব বাহাদুরকে বলে তোকে ওঁদের 'নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনে' ভরতি করে দেব। ...শফি, তুই এখনও নাবালক। শাদি দিলে তোর লেখাপড়া কিছুতেই হবে না, বাবা!

শফি এরপর চলে গেল মৌলাহাট ছেড়ে, শাদি হবার তত ব্যগ্রতা ছিল না তার অন্তরে, কিন্তু মৌলাহাটের দিলরুখ বা রুকুর জন্য মাত্র ষোলো বছর বয়সেই সে যে গভীর পিয়াসী ছিল তা তেমন করে বোঝেনি। বুঝল দুজনের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠল যখন—সময়ের ও স্থানের ব্যবধান। কাজি হাসমত আলির হরিণমারার বাড়িতে থেকে প্রসন্নময়ী হাই ইংলিশ স্কুলে পড়তে গিয়ে শফির আস্তানা হল কাজির দলিজ ঘরে। তার দেয়ালে মক্কা-মদিনার ছবি সাঁটা। আর একটা ছবি ছিল পবিত্র বোররাখ ঘোড়ার। ইসলামি ধর্মবিশ্বাসে যে-ঘোড়া পয়গম্বরকে সওয়ার করে সাত সাতটা আসমান পেরিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল আল্লাতালার সামনে। বোররাখের শরীর পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো আর মুখমণ্ডল সুন্দরী নারীর, যার চুল এলানো। কাজির ঘরে তক্তাপোশে শুয়ে শফি দেখত বোররাখের মুখে সুন্দরী দিলরুখের মুখ। সেই মুখচ্ছবির মায়া তাকে অস্থির করত, কাঁদাত। তারপরে একরাতে স্বপ্ন দেখল, রুকুকে কবরে শোয়ানো হচ্ছে। কে যেন বলছে, শফি তুমি শেষ দেখা দেখে নাও। তারপরে শাদা কাফনপরা রুকুর মুখের আবরণ সরাতেই শফি চিৎকার করে উঠল।

শফির পক্ষে এই মৃত্যুদৃশ্য সকরুণভাবে সত্য, কারণ রুকুর সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় না, তার উচ্চশিক্ষার কারণে দেশান্তরে থাকায়। একদিন তার কাছে বজ্রাঘাতের মতো খবর আসে রুকুর বিবাহ হয়েছে শফির প্রতিবন্ধী ও পশুস্বভাবের অর্ধমানব মেজভাইয়ের সঙ্গে। বলতে গেলে এ হল রুকুর একরকম অসহায় মৃত্যুই। মুসলমান অন্তঃপুরে গ্রাম্য পরিবেষ্টনে অশিক্ষিত অপরিণত বয়সের কিশোরীর মন কেই বা কবে বুঝতে চেয়েছে? অন্তত উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিকালের সময়ে ইসলামি বিধিব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠেনি। তার ওপর মৌলানা বদিউজ্জামানের সন্তানের সঙ্গে রুকুর বিয়ে হচ্ছে, সে

তো কৃতার্থ হবার ঘটনা—কী আর এমন হেরফের—ছোটভাইয়ের বদলে মেজভাইয়ের সঙ্গে শাদি। সেই শাদি দিয়েছেন শফির প্রবল প্রতাপান্বিত পিতা, যিনি মসজিদবাসী কিন্তু রাতে যৌনতাড়নায় বাড়িতে স্ত্রী সম্ভোগ করতে এসে সাইদার কাছে বাধা পেয়ে সরোষে তার গালে থাপ্পড় মারেন। এই রোষের কারণ সাইদার আত্মাভিমানের কটু মন্তব্যে। সাইদা প্রশ্ন তুলেছিলেন মৌলানার অন্য নারীর প্রতি আসঙ্গ লিপ্সার বিষয়ে।

অলীক মানুষ এদিক থেকে দেখলে ইসলামি অন্দরজীবনের এক তথ্যপূর্ণ ডকুমেনটেশন। কোরান-হাদিশে যে সব নির্দেশ আছে তা পুরুষকেন্দ্রিক। প্রয়োজনে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ইসলামি পবিত্র গ্রন্থের নানা নির্দেশের ব্যবহার করেছেন। 'চাষী যেমন তার শস্যক্ষেত্রের দিকে যায়, পুরুষ যাবে তার আওরতের দিকে' এই নির্দেশের পাশাপাশি উদ্ধৃতি আছে, 'আউরত তার পুরুষের খাহেস পূর্ণ করতে সবসময় তৈরি থাকবে, যদি সে রজস্বলা না হয়।' এইখানে এসে বোঝা যায় বুজুর্গ ধর্মগুরুর দৃষ্টিকোণ কেন এমন উগ্র। বদিউজ্জামান ভেবেছিলেন সাইদা তাঁর শস্যক্ষেত্রের মতো। ধর্মত তার প্রতি তাঁর অধিকার। প্রতিহত পৌরুষ তাই স্ত্রীর গালে চপেটাঘাত করে মসজিদে আশ্রয় নেয়। মসজিদের অন্ধকার কোণে মশারির মধ্যে বসে 'ইত্তেফাক' নিয়ে মৌনী থাকলেই তার আত্মশুদ্ধি ও মনশ্চাঞ্চল্য কেটে যাবে। কিন্তু সাইদার কী হবে? সে তো ধর্মত কোনো প্রত্যাঘাত করতে পারে না, নারী হিসেবেও পারে না, কারণ ইসলামি সমাজ সেই অধিকার তাকে দেয়নি। তার শিক্ষাদীক্ষাঘটিত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। সাইদার বিদ্রোহ তাই যৌন-শীতলতায় ও শয়ন ঘরের প্রতিবাদেই থেমে যায়, সংসার থেকে পরদা থেকে তার নিষ্ক্রান্ত হওয়া সাজে না। কিন্তু সাইদার বেয়ান দরিয়া বিবি আত্মহত্যা করে কারণ তার মেয়ে রুকুকে সে প্রতিবন্ধী অর্ধমানবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যে মেয়ের হৃদয়ে-মনে আঘাত দিয়েছে এবং তাকে পরিণত করেছে যৌন নিপীড়নের নিষ্ঠুর শয্যাসঙ্গিনীর ভূমিকায়, এই অপরাধবোধ তাকে বিড়ম্বিত করে। রোজি আর রুকু তার দুটি ফুটফুটে মেয়ে। বিয়ে হবার কথা নুরুজ্জামান ও শফিউজ্জামানের সঙ্গে। নুরুর সঙ্গে রোজির বিয়ে হল

কিন্তু রুকুকে কেন সে পশুতুল্য মনিরুজ্জামানের সঙ্গে বেঁধে দিল? সিরাজ লিখেছেন :

> রুকু ভাবে, যদি সে 'জন্তু মানুষটার' বউ না হত, তাহলে সংসারে কর্তৃত্বের ন্যায্য শরিকানাটি দখল করতে সেও হয়তো কোমরে আঁচল জড়াত। কিন্তু কী দরকার অত ঝামেলায় নাক গলিয়ে। বেশ তো আছে।
>
> না,—সত্যিই সে ভালো নেই। যখন-তখন একটা জন্তু মানুষের কামার্ত আক্রমণ, এমন-কি রজস্বলা অবস্থাতেও রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে রুকু তার অবশ শরীর রেখে পালিয়ে যায়—পালাতেই থাকে, দূরে—বহুদূরে। কিন্তু কোথায় যাবে?

সেকালের মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরে তেরো-চৌদ্দ বছরের বালিকা বধূর ওপর যৌন নিগ্রহের এমন চিত্রণ যেমন মর্মন্তুদ তেমনই তথ্যপূর্ণ, ডকুমেন্টারি।

রোজি-রুকুর মা বিধবা দরিয়াবানু একরাতে আত্মঘাতী হয় গ্লানি ও আপশোসে। রুকুর অমন করুণ বিবাহ এবং নিগৃহীত নারীসত্তার কষ্ট তার মাতৃহৃদয়কে দগ্ধ করছিল কিন্তু সামাজিক অসহায়তায় নিজের কিছু করবারও ছিল কি? সবই নসীব বলে যখন মেনে নিয়েছিল তখন একদিন বারি চৌধুরী এসে তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন 'একটা ছেলের জিন্দেগি' দরিবুবু বরবাদ করে দিয়েছে। দরিয়াবানু আত্মধিক্কার দিয়ে রোজি-রুকুকে বলে, 'সব কানে আসে। গাঁয়ের লোক কত হাসাহাসি করে। লোকু ছড়াদার সঙের গান বেঁধেছে। কুচ্ছোর শেষ নাইকো আমার নামে। রাগে দুঃখে ঘেন্নায় ছাতি ফেটে যায়।'

এরপর দরিয়াবানু ডুমুর গাছে গলায় দড়ি দেয় সেই রাতে, রুকু মেনে নেয় তার জন্তুমানবের কামনা, কিন্তু শফির কী হয়? তার মনের উথাল পাতাল, তার স্বপ্নভঙ্গের পুঞ্জিত বেদনা কী রকম? শফির জবানী :

> ইচ্ছে করছিল সবকিছুতে লাথি মারি। গুঁড়িয়ে ফেলি সাজানো নবাবি ঘরের আসবাবপত্তর। ছুটে বেরিয়ে যাই একটা কালো রঙের ঘোড়ার পিঠে চেপে—ছুটতেই থাকি ক্রমাগত, দিনভর

রাতভর—আমৃত্যু। ... ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা। আমার বুকের ভেতরটা ঘৃণায়, আর অসহায় রোষে আর ক্ষোভে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল।

আশ্চর্য যে, রুকু আর শফির ভাবনায় একটা নিষ্ক্রমণের তীব্র আবেগ রয়েছে—দুজনেই পালাতে চায়। কিন্তু তফাত আছে ভাবনার। স্বামীর কামনাপিষ্ট হয়ে রুকুর শরীর থেকে তার মন চলে যেতে চায় 'দূরে—বহুদূরে। কিন্তু কোথায় যাবে?' নারী বলেই তার যদৃচ্ছ যাবার স্বাধীনতা নেই এমনকী মনকেও সে ছোটাতে পারে না। আর শফি? ক্রোধে ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে তার মন এক কালো ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতে চায়, ক্রমাগত ছুটতে থাকে। তার কি তাহলে মুক্তির একটা পথ খোলা আছে? ঘৃণা ক্ষোভ আর রোষ মেটাবার কোনো উৎস আছে?

এবারে সে নদীতীরে খুঁজে পায় মেহরু নামে একজন আর তার বউ আসমাকে। মেহরুদ্দিন খামরু নামের মধ্যে ধরা আছে তার উজ্জ্বল অতীত, এককালে তাদের ছিল অনেক জোতজমি আর খামার। এখন খামার নেই, সব ফৌৎ, পদবীটা খসে গেছে, নামটাও হয়ে গেছে শীর্ণ। সে এখন নিম্নবর্গের মানুষ, তার বউ আসমা তালডোঙা চড়ে ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত, স্বাধীন নারী—লোকায়ত জীবনের মতো আস্বাদকামী, নদীর মতো ব্যাপ্ত, স্রোতের মতো সঞ্চয়হীন। এতদিন শফি ধর্ম ও নারীর টানাপোড়েনে পাক খাচ্ছিল। এবারে মুখোমুখি হল নদী ও নারীর এবং দুইয়ের মধ্যস্থ সতেজ প্রাকৃতিকতায়। শফি জানত তার শরীরে বংশধারায় বইছে পয়গম্বরের রক্ত। কিন্তু তার সামনে নদী, নদীতে তালডোঙা, ডোঙায় সে আর আসমা। এবারে,

আসমা বৈঠাটা নরম ঘাসে ঢাকা মাটিতে বিঁধিয়ে দুটি মুক্ত হাত উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে লাগল। উন্মোচিত হল তার স্তন। পুরোপরি নয়—অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হাহাকার করতে করতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আসমা তাকে আসঙ্গ কামনা মিটিয়ে গোপনতার আশ্বাস দিয়েছিল :

ওপরে আসমান, নিচে মাটি—পক্ষিটিও জানবে না। ... এমন করে

মনের সুখ মেটে না। তুমি দুপোরবেলা ঝোপের ভেতর থেকো। তখন মিন্‌সে থাকে না কুঁড়েতে। দহে মাছ ধরতে যায় জাল নিয়ে। আমি লিয়ে আসব তোমাকে।

শফি অবশ্য এই প্রাকৃতনারীর নির্লজ্জ আহ্বানে আর সাড়া দেয়নি। তার কারণ সম্ভবত একদিকে মৌলানা বংশের খান্দান আরেক দিকে শিক্ষিত ও মুক্তিকামী বিবেক। তার নিজস্ব স্বপ্নের প্রেয়সী রুকু হয়ে গেছে তাদেরই পরিবারের বধূ কিন্তু অগ্রজের কামনাসঙ্গিনী, এই রুদ্ধ অবর্ণনীয় বেদনা ও ক্ষোভ থেকে সে ছুটে গিয়েছিল যেন স্বপ্নের সেই কামনার কালো ঘোড়ার বিকল্পে। আসমার নগ্নরূপ, নদী ও নির্জন নিসর্গ শফিকে কামনায় প্ররোচিত করে ক্ষণিকের মোহে। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত দেহসঙ্গম তাকে আনন্দ দেয়নি, স্বস্তিও নয়—কেবল এনে দিয়েছে কী রকম যেন এক অনপনেয় বন্দীত্বের অনুভব। সিরাজ তাঁর সংবেদপূর্ণ লেখনীতে নারীর অনুষঙ্গে এসে-পড়া শৈশবকে চমৎকার টেনেছেন। দেহসঙ্গমের আগে তালডোঙায় পরিভ্রমণরত নারীর সামনে বেপথু শফির কথা বলেছেন তার এই জবানিতে :

> ... একটা প্রগল্‌ভ মত্ততা আমাকে বাচাল করে ফেলল। আশ্চর্য, আমি হেসে উঠলাম। রুকুর কথা ভুলে গেলাম। অকিঞ্চিৎ হয়ে গেল রুকু এইসব কিছুর কাছে, যার ওপারে স্বাধীনতা—প্রকৃতি, বারি চৌধুরীর নেচার। আর আসমাও হাসছিল। তার গায়ে ... জামা ছিল না। তার পরনে ছিল নীলচে নেতিয়ে যাওয়া তাঁতে বোনা শাড়ি—সেও হাঁটুর নীচে অব্দি টানা। তার এক হাতে ছোট্ট একটা বৈঠা। অন্যহাতে কীভাবে হঠাৎ খোঁপা-ভেঙে পড়া চুল ঝুঁটি বাঁধতে গিয়ে উন্মোচিত হয়ে গেল স্তন। ভরাট, নিটোল, কোমলতাময় কাঠিন্যে অসংবৃত তীক্ষ্ণাগ্র একটা মাংসপিণ্ড, যা আমার মতো ষোলো-সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলেকে দ্রুত ফিরিয়ে দেয় তীব্র স্মৃতিতে ভরা এক হারানো পৃথিবী আর সময়কে, তার ধোঁয়াটে ধূসর শৈশবকে।

বিশ্লেষণের গাঢ়তা মুহূর্তে প্রকৃতিসান্নিধ্যে অসহায় নরনারীকে এক সূত্রে

গেঁথে দেয়। নদী থেকে নারী, নারী থেকে শৈশব যেন একই বৃত্তের অংশরূপে দেখা দেয়। এর পরেই শফির মনে আসে প্রসঙ্গান্তর, দ্বিতীয় ধাপের সেই চিন্তন প্রণালী :

> এখন ভাবি, পুরুষের জীবনে ওই যেন কঠিন নির্বাসনের কষ্ট-কাল! নারীর জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসে নিরন্তর নারীর সঙ্গে স্পর্শে-সাহচর্যে বেড়ে উঠতে উঠতে তারপর সে ধীরে দূরে যেতে থাকে অথবা তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় দূরে। নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট তাকে অচ্ছুৎ করে ফেলে। নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে প্রিয় এক জগৎ, এবং নির্বাসিতের মতো, অচ্ছুতের মতো, তারপর দূরে সরে থাকা। আবার প্রতীক্ষায় থাকা, কবে ফিরবে প্রিয়তম ঘরে? কবে ফিরে পাবে সে নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট এবং নারীর জরায়ু—শরীরের পারুষ্যের যৌবনের রক্তমূল্য দিয়ে সবল পেশীর শক্তি দিয়ে হবে তার প্রত্যাবর্তনজনিত পুনরাভিষেক? কবে সে ফিরবে পুরানো কোমল ঘরে? কৈশোর সেই প্রতীক্ষা আর নির্বাসনের কাল।

শফির আত্মবিশ্লেষণ তাকে পরবর্তী রিরংসা থেকে বাঁচায়। আসমার কামনা সে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু তার ধর্মগুরু পিতা মসজিদবাসী হয়েও কামনাতাড়িত হন। স্ত্রীর কাছে ভোগলিপ্সা মেটাতে না পেরে, ইকরাতুন নামের এক নারীকে জিন থেকে বাঁচাবার ছলে গ্রস্ত হয়ে পড়েন তার শরীরী ফঁদে, তাকে নিকে করে বসেন। পরিণামে আসে আত্মধিক্কার। তাকে ত্যাগ করেও স্বস্তি আসে না। শফির ধারণা পরিত্যক্ত ইকরাতুনের যে সন্তান বেঁচে থাকে তা আসলে তার পিতারই ঔরসজাত। ইকরাতুন প্রসঙ্গেই মৌলবীর সঙ্গে সাইদার বিরোধ। একমাত্র ধর্মের খোলস বদিউজ্জামানের আশ্রয় হয়ে ওঠে। হয় মসজিদে বসে থাকেন অথবা বেরিয়ে পড়েন দীর্ঘ দিনের ভ্রমণে গ্রাম থেকে গ্রামে।

মৌলানা বদিউজ্জামান এ উপন্যাসের গোড়া থেকেই ভ্রমণশীল। তার বড় কারণ এটাই যে, সাধক প্রকৃতির মানুষরা হন ঠাঁই-নাড়া স্বভাবের। লেখক সিরাজ যে-জীবন ও ধর্মসমাজ নিয়ে অলীক মানুষ লিখেছেন তা

গড়পড়তা বাঙালি পাঠকের কাছে সুপরিচিত নয়। এ-উপন্যাসের তাই দু'রকম পাঠ দরকার। এক, আখ্যান ধরে আদ্যন্তমধ্য সমন্বয়ে—সে পরিক্রমা কঠিন যেহেতু এর লিখন পদ্ধতিতে রয়েছে কোলাজের ধরন। দুই, ইসলামের ধর্মীয় ও লোকায়ত দুই বিন্যাস মিলিয়ে পড়া। বদিউজ্জামানের মতো ফরাজি ধর্মগুরুর ক্রিয়াকলাপ ও জীবনযাপন প্রণালী, বিশেষ করে উনিশ-বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্বে, পাঠকের পক্ষে জানা থাকা সম্ভব নয়। একটা কথা শুধু অনুমান করা যায় যে, এই শ্রেণির মানুষদের সাধনভজনের প্রবণতা বেশি, উপাসনা ও উপাসনালয়ের মধ্যে থাকাই এঁদের প্রথম পছন্দ। গৃহী কিন্তু চাষ-আবাদ গৃহস্থ কিংবা জমিজমার বিস্তার ও ফসলের স্বপ্ন এঁদের পক্ষে কোনো আকর্ষণই নয়। আসলে এঁরা একরকমের পরজীবী। ধর্মের নামে বস্তু আহরণকারী। সারা মরশুম শিষ্যরা গাড়ি বোঝাই ধান ও খন্দের বস্তা, টিন টিন গুড় পৌঁছে দেয়। ধান বেচে মৌলবীপত্নী পুত্রবধূর সোনার নথ বানিয়ে দেন। উপাসনাপ্রবণ বদিউজ্জামান অমায়িক, মিষ্টভাষী ও ভাবপ্রবণ, কিন্তু সেই সঙ্গে খামখেয়ালি, জেদি ও হঠকারী স্বভাবের। তাঁর ঘোষণা : 'মাটি নিয়ে দুনিয়াদারি আমাদের নয়'। কেনই বা হবে? অন্যের শ্রমলব্ধ শস্যে যাঁর স্বচ্ছন্দে দিন কাটে তিনি কেন মৃত্তিকামুখী পরিশ্রমী হতে যাবেন?

সেইজন্য মৌলবীর টান নেই কোথাও বসত গড়ার, ক্যারাভানের মতো চলেছে তাঁর চলমান সংসার, বদলে যাচ্ছে বাস্তু। শফির জন্ম পদ্মাতীরের কাঁটালিয়া গ্রামে। তার যখন তিনবছর বয়স তখন ফরাজিগুরু তাঁর গেরস্থালি তুলে চলে যান পোখরায়। শফির ষোলো-সতেরো বছর বয়সের মধ্যে তার পিতার সংসার ঠাঁইবদল করে পোখরা থেকে বিলুটি-গোবিন্দপুর, সেখান থেকে নবাবগঞ্জ, তারপর কুতুবপুর, খয়রাডাঙ্গা—সবশেষে মৌলাহাট। এই মৌলাহাটে এসে উপন্যাস জমি পায়—এসে পড়ে রোজি-রুকু, আয়মনি, দরিবুবু, আসমা, ইকরাতুন। সইদা তাঁর শাশুড়ি ও প্রতিবন্ধী সন্তান নিয়ে সংসার পাতেন। বড় ছেলে ধর্মশিক্ষা সাঙ্গ করে ফেরে, কিন্তু ছোটছেলে চলে যায় চিরতরে।

বদিউজ্জামানের এই ঘন ঘন ঠাঁই বদলের প্রধান কারণ কিন্তু ধর্মীয়। যেখানেই তিনি থিতু হচ্ছেন সেখানেই দুই এক বছর পরে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে সংশয় বা বিতর্ক উঠছে। তিনি 'ফরাজি' অর্থাৎ সংস্কারপন্থী কিন্তু বহু মানুষ 'হানাফি' অর্থাৎ প্রমোদপ্রবণ। তাঁর আরেক প্রতিপক্ষ হল 'পীরপরোস্তি'-তে বিশ্বাসী অজ্ঞ মূর্খ মুসলমানের দল। ইসলামের কঠোর অনুশাসন, নানা 'আকিদা' (বিশ্বাস) ও পবিত্র গ্রন্থের বাণী প্রচারই মৌলানার লক্ষ্য। তার জন্য দরকার তর্কহীন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকারী মুরিদের (শিষ্য) দল, একটি ভালো বাসস্থান ও মসজিদ। গৃহী সন্ন্যাসী ফরাজির সংসারটি তো নিতান্ত ছোটখাট নয়। তিনি ও সাইদা, চলচ্ছক্তিরহিত জননী কামরুন্নেষা, প্রতিবন্ধী মেজছেলে মিনি, ছোটছেলে শফি, বাঁজা গোরু মুন্নি, ধাড়ী ছাগল বাচ্চাসহ কুলসুম, কয়েকজন বিনা বেতনের বান্দা এবং বেশ কজন অনুগত শিষ্য। সাতখানা গোরুর গাড়িতে চেপে এই বাহিনী পৌঁছয় মৌলাহাটে। এতদিনে মৌলবী সায়েব মনোমত ঠাঁই পান, পেয়ে যান ধর্মভীরু গ্রামবাসী। যারা বিশ্বাস করে মৌলানা অলৌকিক শক্তিধর। অনবরত 'মোজেজা' বা দিব্যদর্শন করেন, তাঁকে নাকি সর্বদা ঘিরে থাকে সাদা জিন ও কালো জিন। পাঁচরোক্ত নামাজী এই অলীক মানুষ মসজিদের অন্ধকারে ফেরেস্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।

বদিউজ্জামান মৌলাহাটে আসার আগে ছিলেন খয়রাডাঙায়। সেখানকার মুসলমান জমিদার তাঁকে ইটের বাড়ি দিয়েছিলেন। ছিল মিনার আর গম্বুজঅলা বিশাল মসজিদ, পাশে ফুলবাগান। মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় ছিল পাশাপাশি অনেকগুলি ঘর, ধর্মশিক্ষার্থীদের জন্য। একেবারে যাকে বলে আদর্শ ফরাজি গুরুর স্থান ও পক্ষবিস্তারের উপযোগী। জমিদার ছিলেন হানাফি। সংগীত ও সাহিত্য প্রিয়। মৌলানার প্ররোচনায় সেসব ছেড়ে ফরাজি মতে শামিল হয়েছেন। গান-বাজনা এখন গ্রামে হারাম, কড়া পরদা চালু হয়েছে। পিরের আস্তানায় হত্যা দেওয়া, মানত কিংবা বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ। কবরে মাথা ঠেকানো বা মেলামেশা বন্ধ। বদুমৌলানার কাজ হল পিরের দরগা ভেঙে দেওয়া। নির্জন মসজিদে তিনি বেশি সময় থাকেন ধ্যানে প্রার্থনায়। মাঝে মাঝে

একা চলে যান ফাঁকা জায়গায়। পরনে থাকে সাদা আলখাল্লা, হাতে ময়ূরমুখো ছড়ি, মুখে বড় শাদা দাড়ি। তাঁকে মনে হত দিব্যপুরুষ। অনবরত তিনি নাকি দিব্য দর্শনের মধ্যে থাকেন অর্থাৎ লৌকিক জীবন পরিবেশে তিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। তবু এহেন ধর্মনেতাকে খয়রাডাঙা ছাড়তে হয়—তার বাহ্য কারণ বছরখানেকের মধ্যে মৌলানার প্রতাপ প্রতিপত্তি কমতে থাকে গ্রামসমাজে, যার ফলে জমিদার সাহেব তাঁকে দেখে আসন ছেড়ে সেলাম দেননি। আসলে গ্রামের মানুষ ফরাজি হলেও ভেতর ভেতর ছিল হানাফি মনোভাবের। পিরের ওপর তাদের ভক্তি বিশ্বাস টলেনি, লোকসংগীত ভালোবাসত, শাদি হলে মেয়েরা ঢোল বাজিয়ে বেপরদা হয়ে নাচত গাইত। পাশের গাঁয়ের হানাফিরা মোহরমের তাজিয়া জুলুস এনে খয়রাডাঙায় ঢোকার অনুমতি পেয়ে যেত আমজনতার আগ্রহে। তার মানে সেখানকার আসল সংঘাত ছিল ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে লোকায়তের, নীতির সঙ্গে জীবনোৎসবের, উর্দুর সঙ্গে বাংলাভাষার। আর একটা কথা ভাবা দরকার, সেই যুগে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, চাষিবাসী, হানাফি-ফরাজির ভেতরকার ভাঁজ আত কী বুঝবে? তাদের চাষ জমিতে দুপুরের খাদ্য বা সকালের নাস্তা নিয়ে বাড়ির মেয়ে বউদেরই তো যেতে হবে, কাজেই তাদের পরদা মানা চলে কি? সারাদিনের ভূতখাটনির পর একটু রং তামাসা, গানবাজনা করবে না তারা? ইসলামের সঙ্গে লৌকিক সমাজের এই লড়াইতে বরাবর কট্টরবাদীদের পরাজয় ঘটেছে। সাধারণস্তরের অশিক্ষিত মুসলমানসমাজ বিশেষত মেয়ে বউরা নানা দৈবদুর্যোগে বিপদে আপদে পিরের থানে মানত করবেই। ইসলামি আকিদায় বিশ্বাস থাকলেও অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কার মরে না। লালন ফকির একদা লিখেছিলেন :

জিন ফেরেস্তার খেলা
পেঁচোপেঁচি আলাভোলা।
ফেঁও ফেঁপি ফ্যাকসা যারা
ভাকাভুকোয় ভোলে তারা।

এ গানে সেই লোকজীবনের কথা আছে, যারা দুর্বলচিত্ত ও অন্ধবিশ্বাসী।

জিন ও ফেরেস্তার বশীভূত, সন্তান কামনায় পেঁচো-পেঁচির মতো অপদেবতার মানত করে, মাঠে ঘাটে আলেয়া ভূতের অস্তিত্ব মানে। যারা 'ফেঁও ফেপি' অর্থাৎ দুর্বল, 'ফ্যাক্‌সা' অর্থাৎ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তারাই ভোলে 'ভাকাভুকো'য় অর্থাৎ কুহকে, ঝাড়ফুঁকে, পিরের থানে। লালনের মতো মানবতাবাদীরা এ সবের প্রতিবাদী ছিলেন, ধর্মের আচরণবাদ ও বাহ্য আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। লোকায়তদের মধ্যে তাঁদের কাজ ইহকেন্দ্রিক জীবনের দিকে, দেহগত সাধনার লক্ষ্যে মানুষকে আনা। ফরাজিরা লোকায়তদের দেখতে পারত না, কারণ লৌকিক সাধকরা ছিলেন মারফতি। কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা তাঁরা অন্যভাবে করতেন। বাহ্য নামাজ-রোজা- হজ-জাকাতের মূল্য দিতেন না।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *অলীক মানুষ* বাংলা কথাসাহিত্যের একটি মূল্যবান দলিল, যেহেতু এতে রয়েছে গত এক দুই শতকের গ্রামীণ ইসলামি জনসংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য কাহিনি। শিয়া-সুন্নির বড় বিভাজনের বাইরেও সেসময়ে ছিল হানাফি-ফরাজির অন্তঃকলহ, মোল্লাতন্ত্রের সঙ্গে মারফতিপন্থীদের 'বাহাস' বা বিতর্ক, আশরফ-আতরাফ-অর্জল ভেদবাদ, পরদাপ্রথা প্রচলনের প্রয়াস, আরবি-ফারসিতে লেখা দ্বীনিবিদ্যাচর্চার সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষার বাস্তবতার লড়াই। কখনও কখনও বাংলা জবানকে সরিয়ে উর্দু লব্জ শেখানোর চেষ্টাও ছিল এ সবই সিরাজ নানাভাবে তাঁর কাহিনি বয়নে এনে কৌশলে একটা ইসলামি বঙ্গ সমাজের টেক্সট বানিয়েছেন, যে-সমাজের সঙ্গে হিন্দু মধ্যবিত্তদেরও একটা যোগ ছিল।

তবু সর্বার্থে *অলীক মানুষ* কয়েকজন ট্র্যাজিক মানুষের কথন। বদু মৌলবী ও শফিউদ্দিন সবরকমভাবে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। শফি তো জীবনটা নয়ছয় করে ফেলেছে। ফেরারি হয়ে শেষমেষ ট্র্যাজিক হিরোর সমাপ্তি মেনে গড়ে তুলেছে অলীক পুরাণ। আর বদিউজ্জামান নামের ফরাজি সাধক লোকমুখে যে হয়ে গেলেন বদুপীর, সে কি কম ট্র্যাজেডি? তাঁর সারাজীবনের ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্যই ছিল আমজনতার ইসলামিকরণ, 'বুতপরোস্তি' তথা পৌত্তলিকতার বিনাশ, 'পিরপরোস্তি' তথা সবরকম আধিদৈবিক ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মানুষের মুক্তি সাধন। অথচ

ঘটল উলটো ব্যাপার। জানা যাচ্ছে :

> মৌলানা বদিউজ্জামান মৌলাহাট অঞ্চলে বদুপির নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু গল্পও পল্লবিত হয়ে থাকবে। যেমন, জিনেরা তাঁর সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে আসত, গোরস্থানে মৃতেরা তাঁর 'আসমালামু আলাইকুম' সম্ভাষণের জবাব দিত। ... রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের পটে শাদা পোষাকপরা গৌরবর্ণ সুন্দর সেই পুরুষকে দেখামাত্র তারা বুঝতে পেরে থাকবে, এই সেই মোজেজাসম্পন্ন মানুষ, যাঁর কথা তাদের পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহরা বলে এসেছেন।

এ ভাবেই লোককাহিনির নির্মাণ হয় দেশে দেশে। বদু মৌলবী কিন্তু তাঁর জাগতিক বুদ্ধি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং শরীরী বাসনা-কামনা নিয়ে থেকে যান নিঃসঙ্গ। সাইদার প্রত্যাখ্যান, শফির আত্মগোপন তাঁকে ধ্যানের জগৎ থেকে ভ্রষ্ট করে। ধর্মপ্রচারের ছলে তিনি কেবলই পশ্চাদপসরণ বা দূরাপসরণে মনোযোগী হয়ে পড়েন। চলে যান একা একা মৌলাহাট থেকে শিষগাঁ, শিষগাঁ থেকে হাটুলি, হাটুলি থেকে কাঁদরা, সেখান থেকে ভবানীপুর, তারপর মনিগ্রাম-বিনোটিয়া। শেষপর্যন্ত তিনি ফেরেন এবং ধরা পড়েন ইকরাতুন নামের নিম্নবর্গের দুশ্চরিত্রা নারীর মোহে। সে মোহভঙ্গ ঘটে অচিরে। তবু তিনি তাঁর অলীক চেতনার জগতেই থেকে যান—অন্তত সাধারণ মুরিদরা তাঁকে লোকোত্তর প্রতিষ্ঠা দেয় তাদের মনে।

আর স্বনির্বাসী শফিউদ্দিন? বিদ্যাচর্চা, প্রকৃতি, নারী সাহচর্য, ব্রহ্মবাদ ও মননচর্চা কিছুই তাকে শমতা দান করতে পারে না। এতবড় পৃথিবীতে শেষপর্যন্ত তার কোনো বাসভূমি গড়ে ওঠে না—সে হয়ে ওঠে হত্যাপরায়ণ। যেন রাজা লিয়রের মতো উন্মাদপূর্ব মানস থেকে বলতে চায় :

I will do such things
What they are yet I know not
but they shall be

The terror of the earth.

কিন্তু ঘাতক এই মানুষটির নাম লোকের মুখে মুখে হয়ে দাঁড়ায় ছবিলাল। পৃথিবী দুঃখময়, বাসযোগ্য নয়—তাকে বাসযোগ্য করার জন্য লড়াই করতে চেয়েছিল শফি, হয়ে গেল *অলীক মানুষ*।

বিভূতিভূষণ : ছোট গল্পের লোকয়াত অনুবিশ্ব

সাহিত্য পাঠের প্রধান লক্ষ্য একসময় ছিল নান্দনিক অর্থাৎ লেখাটি ভাল লাগা। কেন সেই ভাল লাগা তার কারণ খুঁজতে গিয়ে কেউ বললেন জীবনের অতল অভিজ্ঞতার কথা, কেউ বললেন সমাজ সচেতনতা বা শ্রেণিবোধের প্রসঙ্গ, কারুর মনে হল মানব-মনস্তত্ত্বের জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বর্ণালী। কিন্তু দেখা গেল সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি কেবলই বদলে বদলে যায়। একেক সময়ে জোর পড়ে একেক দিকে। তার ফলে এক সময়ের সাড়া-জাগানো লেখা পরবর্তী সময়ে অনাদরে উপেক্ষিত হয়। আবার উল্‌টোটাও ঘটে। একসময়ে যে রচনাটি মনে হয়েছিল অনুল্লেখ্য, অতি সাধারণ, পরবর্তী সময়ে সেটির পাঠযোগ্যতা ও তাৎপর্য আবিষ্কৃত হয়, ফলে সেটি বহুপঠিত হয়ে জনপ্রিয় হয়। এর বাইরে আর একটা দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু গল্প আমরা পড়েছি, বলেছি 'বেশ', কিংবা বলেছি 'মন্দ নয়', তারপরে আর উচ্চবাচ্য করিনি। কিন্তু একটা কথা তো ভাবতে হবে, যে, লেখক কোনো বিশেষ টানেই গল্পগুলি লিখেছেন। 'বেশ' কিংবা 'মন্দ নয়' বললেই তাঁর প্রত্যাশা বা প্রাপ্য মেটে না। তিনি কেন ঐ গল্পটা লিখেছিলেন সেই ব্যাপারটা অনুধাবন করা দরকার। গল্পের বিষয় বা বক্তব্যে কী এমন তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা আছে সেটা যদি ধরতে না পারি তবে তার সঠিক পাঠ হয় না। *বিভূতি রচনাবলী*-র পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে তাঁর প্রচুর গল্প একত্র রয়েছে। পড়তে পড়তে কয়েকটি গল্প আলাদা করে সনাক্ত করতে পেরেছি। যার মধ্যে থেকে আমাদের লোকায়ত জীবন ও সেই বর্গের মানুষজন সম্পর্কে তাঁর এক আর্দ্র অনুকম্পায়ী মনের ধরন খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নবর্গের জীবন বিষয়ে তাঁর যে দৃষ্টিকোণ তা এত আধুনিক ও সমৃদ্ধ যে চমক লাগে।

প্রথমেই বলি '*গিরিবালা*' গল্পটির কথা, যার ধরতাই : 'দেশের বাড়িতে অনেকদিন ছিলাম না। গ্রামের অন্য সব পাড়ার লোকদের ভালভাবে চিনিনে বা জানিনে।' এমনই একজন অজানা অচেনা নারী গিরিবালা, সাদা-থান-পরা বিধবা একদিন লেখককে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল এবং তাঁর বাড়ি একদিন যেতে চাইল। লেখকের বর্ণনা : 'এখন ওকে দেখে মনে হয় না কোনোদিন ওর যৌবন ছিল! তবে রঙটা এখনও বেশ ফর্সা আছে, চোখদুটি এখনও সুন্দর'। গল্পের সময়কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্ব। গ্রামের গদাই পাড়ুই লেখককে জিগ্যেস করে, 'দাদাঠাকুর যুদ্ধির খবরটা কী?' সেই সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার পাশে গিরিবালা একদিন এসে আচমকা জিগ্যেস করে, 'বাবা, ব্রহ্ম কি?' এ প্রশ্নে বিস্ময়ের দুটো ফলা ছিল। প্রথমত প্রশ্নটাই বেশ চমকদার, দ্বিতীয়ত প্রশ্ন যে করছে সেই গিরিবালা একজন কুচরিত্রা গ্রাম্য নারী, যার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার স্বাভাবিক কোনো ভিত্তি নেই।

অনুসন্ধানে লেখক গিরিবালার অতীত জানতে পারেন গ্রামের বয়স্ক ভগ্নস্বাস্থ্য ফটিক চক্কত্তির কাছে—

> অনেক ফূর্তি করিচি ওর সঙ্গে। ওর চেহারা ভারী সুন্দর ছিল। যেমন নাচতে পারতো তেমনি গাইতে পারতো। একবার নন্দ পাল, যতীন দত্ত আর শশী আচার্যি—তিনজনে দোলের দিনে ওর ঘরে সে ফূর্তি কি! ওর মদ খেয়ে সে ঘুরে ঘুরে নাচ কি! কালাপেড়ে শাড়ি পরে ঘুঙুর পায়ে...।

ফটিক চক্কত্তির কাছে শশী আচার্যির নাম শুনে লেখক তাঁর কাছে যান। শশী স্থানীয় কালীমন্দিরের পূজারী, দৃষ্টিক্ষীণ বৃদ্ধ। বললেন—

> গিরিবালা ডাকসাইটে ইয়ে ছিল। সে সব কথা আর তোমার কাছে বলবো না বাবা। হাঁ জানি, সে আশ্রম করেচে, সন্নিসিনি হয়েচে, ওই যে বলে বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী তাই—।

এসব মন্তব্যে লেখকের অনুকম্পায়ী মন কিন্তু টলে না, কারণ লেখকের মনে তো ফটিক বা শশীর মতো গ্রামবৃদ্ধের অচলতা নেই। জীবনের বহতা স্রোত দেখাই তাঁর কাজ। তাই গিরিবালা তাঁর মনের প্রশ্রয়ভূমি পায়, তাঁর

বাড়িতে যায় আসে, একদিন *সাধনতত্ত্ব ও জীবমুক্তি* বইখানা দিয়ে বলে, আপনার বাড়িতেই বইখানা থাক বাবা। মাঝে মাঝে এসে শুনে যাবো। বড় ভালো বই বাবা। তা আমি তো লেখাপড়া জানি নে...।'

তাকে টানা দু'ঘণ্টা সাধনতত্ত্ব পড়ে শোনাতে হয় মাঝে মাঝে। কাজটা লেখকের পক্ষে রোচক লাগে না, কারণ তিনি অন্যবর্গের মানুষ, যতটা জীবনজিজ্ঞাসু ততটা মুমুক্ষু নন। গিরিবালার বৃত্তান্তে ক্রমশ পাঠক জানতে পারে বৃন্দাবনতীর্থ দর্শন অন্তে সেখানে অকস্মাৎ গিরিবালা পেয়েছে এক গোপাল মূর্তি, তাকে প্রতিষ্ঠা করে গড়ে তুলেছে আশ্রম। সেই আশ্রমে লেখকের সস্ত্রীক আমন্ত্রণ হল পূর্ণিমার উৎসবে। সেকালের খামার কালনা গ্রাম, যা এখন জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ তারই এক বটতলায় আশ্রম। অনেক সাধারণ নীচ অন্ত্যজ মানুষদের ভীড় সেখানে। তাঁরাই রাঁধল, খাওয়াল, খেল, কীর্তন গাইল। লেখক সবিস্ময়ে দেখেন, 'যে যখন আসে, আগে গিরিবালাকে সাষ্টাঙ্গে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করে দুহাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দেয়'। জেনে আরও অবাক হন যে 'গিরিবালার মুখে কিছু ভালো কথা শোনবার জন্যে ওরা এসেচে।'

গিরিবালা লেখককে বলে, 'আমিই বা কি কথা বলি। আমি বলি, তাঁর ওপর ভক্তি রাখো সব হবে।... বাবা, ওরা কোথায় যাবে বলুন? সংসারে ধরে কাকে? কার ওপর নির্ভর করে? একটা কিছু চাই তো। আমাকেই এসে মা বলে ধরে।...ওরা সংসারী মানুষ, ওদের বুঝতে হবে সংসারের ভেতর দিয়েই।'

আশ্রম থেকে রাতে বাড়ি ফেরার পথে গিরিবালার যে-ভক্ত আলো ধরে লেখকের সঙ্গে যায়, সে বলে, 'ভগবানের কথা...আমাদের ওসব কে বলচে বলুন। চাষালোক সারাদিন ভুঁই চাষ ক্ষেতখামার নিয়েই থাকি। মায়ের ছিরিমুখ থেকে ছাড়া আর পাচ্চি কোথায় বলুন—কে মোদের শোনাচ্ছে।'

এইবারে গল্পের সঠিক দৃককোণ খুলে গেল। গিরিবালা নামে নষ্ট অতীতের নারী অন্য এক বিভায় যেন ধরা পড়ল লেখকের চোখে। সমাজে গিরিবালার প্রকৃত স্থানটি কোথায় তা বুঝতে পেরে লেখক গল্পের

শেষে বলছেন :

> গঙ্গানদী সব জায়গায় নেই, কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে শাখা নদী, খাল, সোঁতা সমস্ত দেশের সব লোকের কাছে পৌঁছে দেয় জীবনদায়িনী বারিধারা। গিরিবালা বড় নদীর একটি ক্ষুদ্র সোঁতা, ছোট, অজ চাষীদের গ্রামে জল বিতরণ করে বেড়াচ্চে, তা যতই ঘোলা হোক, তবু সেটা জলই, তাতে স্নান করে, জল পান করে লোক তৃপ্ত হন। নইলে এইসব গরীব লোক বাঁচে কিসে?

এইবারে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য এবং মানবিক সহানুভূতির দিকটা ধরা গেল। এমনতর উপলব্ধি থেকে মহৎ লেখকের জাত চেনা যায়। গল্পে এমন কিছু বৈচিত্র্য নেই কিন্তু ঠিক জায়গায় জোরটা আছে। সাধারণ পাঠক যার থেকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি পাবে, সংস্কারমুক্ত হবে তার চেতনা। ভেবে দেখলে খুব আশ্চর্য লাগে যে চল্লিশের দশকে এমন সব-অলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গি লেখক কোথা থেকে পেলেন? বড় ধর্ম কেমন করে গৌণধর্মে শাখায়িত হয়ে ব্যাপ্তি পায় এখানে তার ইঙ্গিত আছে।

গল্পের একেবারে শেষে লেখক গিরিবালা সম্পর্কে বলেছেন এরপর তাকে বহুবার দেখেছেন কীর্তন বা ভাগবতী কথার আসরে, ঊর্ধ্বগ্রীব উৎকণ্ঠচিত্ত হয়ে প্রথম সারিতে বসে সে শুনছে। লেখকের মনে হয়েছে : 'খালের জল আগে হয়তো ঘোলা ছিল, এখন ক্রমে ফর্সা হয়ে আসচে' এ-মন্তব্যে লোকায়ত সমাজবন্ধনে, মানবসংসর্গে মানুষের ক্রমমুক্তির বার্তা আছে। ফটিক চক্কত্তি আর শশী আচার্যির মতো উচ্চবর্গের গ্রাম্য মানুষের লোভ ও রিরংসা যাকে পাঁকে ফেলে, নিম্নবর্গ তাকে তুলে দেয় সঠিক অবস্থানে। সেই অবস্থান স্বচ্ছ ও মানবিক দেওয়া-নেওয়ায় সমৃদ্ধ।

এই রকম একটা বোধ থেকে বিভূতিভূষণের আরেকটি অল্পপঠিত গল্প '*পিদিমের নিচে*' পড়তে হবে। গল্পের শুরুতে বলা হচ্ছে :

> একটিমাত্র গ্রামে আমার বাল্যে এই ধরনের এক ব্যক্তিকে আমি

দেখেছিলাম। কেউ তার জীবনচরিত লেখেনি; কেউ জানেও না তাকে, কিন্তু আমি জানি এবং যতটুকু জানি বা নিজের চোখে দেখেছিলাম, লিখে রাখা উচিত ভেবে লিখলাম

'লিখে রাখা উচিত' এমন দায়বদ্ধতা লেখকের নিজের কাছে। মানুষটি একজন গ্রাম্য সাধক। সবাই তাকে পাগল ঠাকুর বলে। তার আস্তানা গঙ্গার তীরে সাতনলির চরের ওপারে, সে 'জেতে বুনো' উচ্চবর্গের ভাষ্যে পাগল ঠাকুর 'অনেক ছোট জেতের গুরুদেব'। তার ওখানে মাঘ মাসে মেলা বসে। সেটা হল, 'বুনো বাগ্‌দি ছোট জেতের কাণ্ড, ছুঁলে যাদের গঙ্গাস্নান না করলে শুদ্ধ হয় না।' সেই পাগল ঠাকুরের সঙ্গে গল্পের কথক পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়ের বালক বয়সে পরিচয় পর্ব থেকে কৈশোর পেরোনো বয়স পর্যন্ত কাহিনির বিস্তার। মাসীর বাড়ি বেড়াতে এলে পতিতপাবন একবার যাবেই পাগলঠাকুরের আস্তানায়। সেটা সাবেক ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে গড়ে-ওঠা তার মাসীমার ঘোর অপছন্দ। পাগল ঠাকুর বালকের পতিতপাবন নামের মধ্যেই পেয়ে যায় এক স্বস্তির আশ্রয়, বলে, 'তুমি যে পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার করতে আসবে না?' এ সেই লোকায়ত বিশ্বাসের দৃঢ় অটল জগৎ। ভক্তি ও একাগ্র সমর্পণের অনুবিশ্ব।

খেজুর পাতার চেটাই পেতে পাগলঠাকুর বসে, আঙিনার ডুমুর বা পেয়ারা ভাতে দিয়ে মেখে কলাপাতায় পরিতৃপ্ত ভাত খায়। গান গায়। আকাশের দিকে আঙুল তুলে তার আরাধ্য গুরু গোঁসাইকে নির্দেশ করে। 'ও আমার হৃদ্‌কমলে পরমগুরু সাঁই' গানটা থেকে লেখক বুঝিয়ে দেন দ্যোতনায় যে, মানুষটি লৌকিক ভাবসাধক। মন্দির-মূর্তি-শাস্ত্র ও মন্ত্রের বাইরের ছকে তার আত্মসাধনা। বালক পতিতপাবনের বিস্ময়ভরা কৌতূহলী চোখ আর প্রশ্নে বিভূতিভূষণ লৌকিক ধর্মের নিখুঁৎ ডকুমেনটেশন করেন। সন্ধ্যেবেলা—

উঠোনের একটা ইঁটের মতো উঁচু মতো জায়গাতে প্রদীপ নিয়ে রেখে দিলে। আমি বললাম— তোমাদের তুলসী গাছ নেই?

—কেন বাবাঠাকুর?

—আমাদের বাড়ি আছে। মাসিমা পিদিম দেয় সন্ধ্যেবেলা।

—তুলসী রাখিনে তো বাবাঠাকুর। গুরুগোঁসাই ঐ পিঁড়েতেই আছেন। তুলসী কি হবে?

—তুমি পুজো কর না বুঝি? তুলসীপাতা না হলে পুজো হয় না। পাগলঠাকুর হেসে বলে, হয় বাবা, হয়। কেন হবে না? সব ফুলে, সব পাতাতেই তাঁর পুজো হয়। তবে পুজো-আচ্চা আমি করিনে বাবা।

— কর না?

—না, বাবাঠাকুর। আমি ছোট জাত, বুনো। তেনার পুজো কি কত্তে পারি আমি? গুরুগোঁসাই পায়ে রাখেন যদি তবে আর পুজোর দরকার কি। পুজো করতে নেই আমাদের।

সংলাপের মেধাবী টানাপোড়েনে বোনা রয়েছে শাস্ত্র আর লোকায়তের দ্বৈত। রিচ্যুয়াল আর ভাবাত্মময় সাধনপ্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব। ছোট জাতের পক্ষে 'তেনার' কাছে পূজাঞ্জলির গর্ব যে পৌঁছোয় না এই অভিমানটুকু কত উজ্জ্বল ও স্পষ্টোচ্চারিত। 'সব ফুলে সব পাতাতেই তাঁর পুজো হয়' এমন উদার উচ্চারণে লোকায়তের ব্যাপ্তি ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে বিশ্বাসের সমর্পিত পূর্ণতা। সেখানে আচরণবিধি ও শাস্ত্র হেরে যায়।

পরে দেখা যায় নিচু পাড়ায় ওলাউঠার মড়ক লাগলে পাগলঠাকুর তাঁর গুরুগোঁসাইয়ের আত্মনির্দেশে নেমে পড়েন সেবাশুশ্রূষার কাজে। যারা মারা যায় তাদের মৃতদেহ গুরুগোঁসাইয়ের বুকে গঙ্গার নামে ভাসিয়ে দিয়ে মনে হয় 'আর ভাবনা কিসের? দেহটা হাঙর কুমীর খেলেও দেহ দিয়ে জীবের উপকার হল।'

এমন একজন ভাবুক সহজিয়াকে উচ্চবর্গের হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ভরা সমাজ পছন্দ করতে পারে না। পতিতপাবন তার মাসীর বাড়ি বেড়াতে এলেই কিন্তু কী এক অপ্রতিরোধ্য টানে ছুটে যায় পাগলঠাকুরের আস্তানায়। মাসী তাতে খুশি হন না। তাচ্ছিল্য করে বলেন, 'কে? ও সেই পাগল ঠাকুর! কেন তার খোঁজে তোমার কি দরকার?' তাঁকে বোঝানো যায় না যে প্রয়োজনটা আত্মিক। পাগলঠাকুর তাকে তাল খেতে দেয়, শশা

দেয়। নিজে খায় ভাত আর ডুমুর, কিংবা তেলাকুচো। মৃত্যুকে পাগলঠাকুর বলে 'খোলস বদলানো'। আপন মনে সে দাওয়ায় বসে গান গায়। তাই শুনে কিশোর পতিতপাবন বোঝে, 'ওর গানই ওর উপাসনা'। সেই গানের বাণী :

ও আমার হৃদ-কমলের পরম গুরু সাঁই
রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।
তোমার সেথা বাঁশের ঝাড়ে
অরূপ রূপের পাথার পাড়ে
বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলেম তাই।
চলার পথে বাদল দিনে তোমার সেই
বাঁশতলাতে দিও ঠাঁই
ও আমার হৃদ-কমলের পরম গুরু সাঁই।

গানটি কোনো চেনাপরিচিত গান নয়। বাঁশফুল আর বাঁশতলার উল্লেখে গান একটা অন্য মাত্রা পায়। এ গান বিভূতিভূষণের রচনা। বাঁশের ফুলে আলোকিত ভুবন তাঁরই দৃষ্টিপ্রদীপের আবিষ্কার।

পল্লিগ্রামের প্রত্যন্তবাসী এই পাগলঠাকুরের সম্পর্কে পতিতপাবনের জবানীতে বিভূতিভূষণ বলে গেছেন কিছু সারসত্য। তাঁর মনে হয়েছে :

> পাগলঠাকুর যদি ঋষি নয়, তবে ঋষি কে? লেখাপড়া জানলে, আর দু-তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের লোক হলে এই লোকেই উপনিষদ রচনা করতো— সরাটির চরের মতো উদার হত তার বাণী, ঝিঙে-ফুলের সৌন্দর্য থাকতো তার ভাষায়, সন্ধ্যেয় সকালে বাঁশবনের পক্ষীকূজনের মতো শান্ত সহজ আনন্দ মিশিয়ে থাকতো তার অঙ্গে অঙ্গে।...কিন্তু একে কেউ চিনলে না।

গল্পের শেষে আছে পাগলঠাকুরের সমাধির বর্ণনা। বহুদিন পর আখড়ায় গিয়ে পতিতপাবন দেখল, বাবলা গাছের তলায় ওর সমাধি। বাবলা ফুল ঝরে পড়ছে তার ওপর। মাসিমা বললেন, 'হ্যাঁ তোমার সেই পাগলঠাকুর আজ বছর দুই হল মারা গিয়েচে। কে জানে, ওসব

ছোটলোকের খবর রাখিনে।' বিভূতিভূষণের কিন্তু মনে হয়েছিল ও মানুষটার কথা 'লিখে রাখা উচিত'। এইটাই তাঁর পৃথক ও স্পষ্ট দৃষ্টিকোণ।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলি প্রকৃতপক্ষে তাঁর পদাতিক জীবনের টুকরো আখ্যান। উপন্যাস তাঁর বেশ বড় জীবনবিন্যাসের পরিধিকে ধরেছে দেশ কাল অভিজ্ঞতা ব্যেপে। ছোট গল্প তাঁর দৈনন্দিন আর প্রাত্যহিকতার পাঁচালি। উনিশ শতকের প্রান্তিকতা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি গ্রামজীবনের নানা মাত্রা ও মূল্যবোধ বিভূতিভূষণের গল্পে গাঁথা আছে। মানুষ ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে, শ্রীভ্রষ্ট হচ্ছে, হারাচ্ছে তার জাতিবিদ্যার উত্তরাধিকার এমনতর নানা ঘটনা ও চরিত্র তাঁর গল্পে এসে গেছে। এককালে যেসব মানুষ বা যেসব জীবিকাকে লোকজন তারিফ করত, পাল্‌টে যাওয়া সমাজব্যবস্থায় তার অনাদর ও উপেক্ষা বিভূতিভূষণের চোখে পড়েছে, তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় কথক, ভ্রাম্যমাণ। বিভূতিভূষণ ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন সেই কথক মানুষটির জীবিকাগত অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্য। তার কারণ শেষ উনিশ শতকের নগরগন্ধী শিক্ষিত সমাজে কথকতা হারাচ্ছিল তার প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রম। বিনোদনের অন্যতর পথ খুলছিল। যাত্রা পাঁচালি কথকতার বদলে থিয়েটার, কীর্তনের বদলে প্রণয়গীতি, গ্রাম্য মেলার বদলে স্বদেশি মেলা, বাউল ফকিরদের লোকায়ত ধর্মধারণার বদলে শাস্ত্রীয় ধর্মাচরণের উত্থান তাঁর কৈশোর যৌবনে দেখা। বিভূতিভূষণের বেশ কটি গল্প আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়, যেগুলি তাঁর লোকায়ত মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। গত শতকের লৌকিক বিনোদনের মাধ্যমগুলি সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ ও মমতা এসব গল্পে অশ্রুবিন্দুর মতো টলমল করছে।

ধরা যাক, '*যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ*' গল্পটি। গল্পের আরম্ভ এইরকম:

আপনারা একালে যদু হাজরার নাম বোধহয় অনেকেই শোনেননি। আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজরাকে কে না জানত? চব্বিশ পরগণা থেকে মুর্শিদাবাদ এবং ওদিকে বর্ধমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড় বারোয়ারীর আসরে যাত্রা হত সেসব স্থানে দশ-বারো ক্রোশ পর্যন্ত যদু হাজরার নাম লোকের মুখে মুখে বেড়াত। কাঠের পুতুল চোখ মেলে চাইত—যদু হাজরার নাম শুনলে। আপনারা কেউ কি যদু হাজরাকে 'নলদময়ন্তী' পালাতে নলের পার্ট করতে দেখেননি? তাহলে জীবনের বহু ভালো জিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভালো জিনিস হারিয়েছেন। আমি দেখেছি।

বাল্যজীবনে প্রথম দেখা যদু হাজরার অভিনয় দেখার স্মৃতি সারা গল্পে ছড়িয়ে আছে। শুধু নলের অভিনয় নয়, শিখিধ্বজের পালায় শিখিধ্বজের অসামান্য অভিনয় তাঁকে সারা জীবনের স্মৃতির পাকে বাঁধে। কিন্তু জগৎ পাল্‌টায়, পাল্‌টে যায় কিশোর সেই যে মুগ্ধ দ্রষ্টা। বড় হয়ে কলকাতা গিয়ে সেখানকার থিয়েটারে বিখ্যাত নটনটীর আলোকোজ্জ্বল উপস্থিতি ও চোখ ধাঁধানো অভিনয়রীতি মনে আসন পাতে। দীর্ঘদিন পরে, এক গ্রাম্য যাত্রার আসরে তিনি দেখতে পান একজন মোটা কালো ও বেঁটে লোককে অভিনয় করতে। 'কেউ তার বেলা একটা হাততালিও দিলেন না, যদিও সে দর্শকদের খুশি করার জন্যে অনেক রকম মুখভঙ্গি করলে, অনেক হাত-পা নাড়লে।'... একজন বলে উঠল—'এ বুড়োটাকে আবার কোথা থেকে জুটিয়েছে? দেখতে যেন একটা পিপে। এ্যাকটিং করছে দেখ্ না, ঠিক যেন সঙ।'

পাশের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন —'ও এককালে খুব নামজাদা অ্যাকটার ছিল হে, তখন তোমরা জন্মাওনি। ওর নাম যদু হাজরা।'

সেই যদু হাজরা এই? লেখকের মনে বিস্ময়ের চমক কেটে যেতেই শুরু হয় মমতা ও সহানুভূতির ক্ষরণ। সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে পরদিন যদু হাজরার সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'কাল আপনার পার্ট বড় চমৎকার হয়েছে।'

বৃদ্ধ আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'আপনার ভাল লেগেছে?...আপনি বোঝেন তাই আপনার ভাল লেগেছে। আর কি মশাই সেদিন আছে? এখনকার সব হয়েছে আর্ট—আর্ট, সে যে কি মাথা-মুণ্ডু তা বুঝিনে।'

বিভূতিভূষণ এরপর মন্তব্য করেছেন—'মনে মনে ভেবে দেখলুম, যদু হাজরার এতদিন বেঁচে থাকাটাই উচিত হয়নি।' এ-গল্প যদু হাজরার ক্রমিক তলিয়ে যাওয়া বা যদু হাজরাদের ক্রম-অবলুপ্তির কাহিনি। শিল্প-মাধ্যম ও বিনোদন পদ্ধতির পরিবর্তমান করুণ কাহিনি। ইঙ্গিতে দেখিয়েছেন লোকশিল্প কীভাবে অন্তর্ঘাতে ম্লান হয়ে যায় নগরায়ণের চাপে।

এর পাশাপাশি আছে অপরাজেয় প্রাণশক্তির গ্রাম্য কথকতা *'বারিক অপেরা পার্টি'* গল্পে একজন কাঁচাপাকা দাড়িঅলা মুসলমান, চালকী গ্রামের বারিক মণ্ডল। প্রায় নিরন্ন ভূমিহীন চাষা অন্ধকার পথে সে গান গায়; 'ওগো বংশীধারী শ্যাম লটবর।' ঘটনাচক্রে বারিক হল লেখকের প্রজা। কিন্তু খাজনা দিতে অপারগ। নানা ছুতোয় কেবল ধার করা তার স্বভাব অথচ শোধ দিতে অক্ষম। মুসুরি বুনবার জন্য অগ্রিম টাকা ধার নিয়ে তাই দিয়ে তার গানের দলের ডুগিতবলা কেনে। আশ্চর্য নির্বিকার লোক। বকাঝকা করলে বলে, 'এই জেলেপাড়ার ছেলে ছোকরাদের নিয়ে বসি। রোজ আখড়াই হয়। গান-বাজনা ভালবাসি বাবু। এবার পুজোর সময় 'সাধন-সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' নামাবো বারোয়ারীর আসরে—দেখি যদি খোদার মর্জি হয়—আমার ছোট ছেলে কেষ্ট সাজে, দ্যাখবেন কি গানের গলা—কি অ্যাক্‌টো—।'

অনাদায়ী টাকার খোঁজে লেখক একদিন বারিক মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে দেখেন, মাত্র একখানা ঘর, ঘরের দরজা জানলার ফাঁকগুলো বাঁশের ঝাপ দিয়ে আটকানো। দোর পর্যন্ত নেই ঘরের। সবশুদ্ধ মিলে অত্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থা। 'দেখেশুনে বেশি রাগ রইল না।' তাগাদার চোটে বারিক তার ঘর থেকে সাড়ে সাত মন ধান বার করে দিয়ে বললে, 'বাবু আল্লার কিরে, ঘরে আর ধান নেই। সব দেলাম আপনাদেরে।'

—তুমি ছেলেপিলে নিয়ে খাবে কি?

—তা আর কি করব বাবু। আমি নালিশকে বড্ড ভয় করি।

দু'দিন পরে দেখা গেল সন্ধ্যাবেলা বারিক তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেহালা বগলে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে সে? 'আজ্ঞে বাবু সালাম। মহল্লা দিতে যাচ্ছি।'

—তুমি কি বেহালা বাজাও?

—ওই অমনি একটু একটু। খোদার মর্জিতে।

ক্রমে জানা যায়, জেলেপাড়ার একটা জীর্ণ ঘরে বারিক এক যাত্রাদল খুলেছে। সে তার বেহালাদার। দলের নাম তারই দেওয়া—বারিক অপেরা পার্টি। 'বাঃ বাঃ, নাম দিয়েচে কে?' লেখকের তারিফ শুনে তারা বলে, 'বাবু, মোরা তো ইংরিজী জানিনে। অন্য অন্য যাত্রাদলের কাগজে যেমন লেখা থাকে, তাই দেখে মোরা একটা মিল খাটিয়ে করেছি। ভাল হয়নি?'

লেখকের অনুকম্পায়ী মন ভালবেসে ফেলে এই যাত্রার দল আর দলের মালিককে। তারা গান শোনায় তাঁকে। কৃষ্ণের গান, মানভঞ্জনের। উঠে আসতে চাইলে বারিক বলে, 'বসুন বসুন। চন্দ্রাবলীর গান একটা শুনে যান না? আমি নিজে শিখিয়েছি।'—

শিল্পসৃষ্টির আনন্দে সে চরম দারিদ্র্যকে চেপে রাখে। অন্যের কাছ থেকে লেখক জানতে পারেন রামচরণ ময়রা বারিকের বলদ-জোড়া ক্রোক করে নিয়ে গেছে। ধান কর্জ পায় না বারিক কারুর কাছে, তাই একবেলা আহার জোটে বড় জোর। কাপড়ের অভাবে তার বউ বাইরে বেরোতে পারে না। ছেলে দুটো অন্যের বাড়ি খেয়েছে, বারিক সস্ত্রীক কদিন উপবাস। অবাক হয়ে লেখক বলেন, 'সে কি কথা! গত সোমবারে ওর গরু ক্রোক হয়েছে বলছ, সেই সোমবার সন্দের সময় যে ওকে বারিক অপেরা পার্টির ঘরে মহা-আনন্দে দুই ছেলেকে নিয়ে গান করতে দেখিচি?'

আশ্চর্য মানুষ বারিক। ধারকর্জ করা দশ টাকার থেকে তবলা ছাইতে খরচ করে তিন টাকা, বেহালার তার কেনে বাকি টাকায়। সন্ধ্যেবেলা পরম উৎসাহে মহড়া দেয়। বলে, 'আমার নামে যখন এ দল, তখন বারিক অপেরা পার্টির যাতে বাইরে নাম ভাল হয়, তা আমাকেই দেখতে হবে,

না কি বাবু? অজামিল কেমন দেখলেন? চলবে? কেষ্ট? বেশ। আপনারা ভাল বললিই ভালো।'

গল্পের উপসংহারে দেখা যায়, তার বড় ছেলে সাতদিনের জ্বরে মারা যায় কবরের কাফন জোটে না এমন অবস্থা। লেখক ভাবলেন পরদিন সকালে বারিকের বাড়ি যাবেন। ভাগের জমি আবার ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত করবেন। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত। অথচ সেই রাতেই দশটা এগারোটা নাগাদ কানে এল বাঁশি বেহালা ডুগিতবলা ও মানুষের রব। ক্ষুৎপীড়িত বিপর্যস্ত লোকশিল্পীর এই অনমনীয় কাহিনি বিভূতিভূষণকে লেখক হিসাবে চিনিয়ে দেয়।

লোক লৌকিকের প্রতি বিভূতিভূষণের খুব টান ছিল। পর্যবেক্ষণ করেছেন গ্রামীণ জীবনপ্রবাহের গভীরে নানান বর্গের লোকায়ত ধর্ম ও আচরণকে। '*ফকির*' নামে একটা গল্প বেশ চমৎকার। গল্পের প্রধান পুরুষ ইচু মণ্ডল অসুস্থ। ভাদ্র মাসের বর্ষণমুখর সকালে তার গায়ে কাঁথা, তাতে অনেক তালি, তার বউ নিমি সেটাই তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। ইচু অসুস্থতার জন্য খেত-মুনিষের কাজ করতে যায় না কিন্তু নিষ্ঠাভরে নামাজ পড়ে। 'এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নামাজ না করে সে দিনের কাজ কখনও আরম্ভ করেনি।' এই মন্তব্যের ধরতাই থেকে বোঝা যায় বিভূতিভূষণ ইচুর মধ্যে সেই মানুষটাকে দেখেন যার দারিদ্র্য কোনোভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে তাকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। পায়রাগাছির ফকির ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে নামজাদা সাধু। ইচু তার খুব অনুরাগী। সংসারে তার মন নেই, পয়সা বা মজুরির দিকে টান নেই। কাস্তে দিয়ে জমির ধান কাটতে কাটতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সবাই তাকে বলে, 'ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো?'

মজুরি নিয়ে দরাদরি করতে পারে না সে, অনেকে ঠকায় তাকে, তবু তার সততা ষোল আনা। গল্পের সময়টা অনুক্ত, কিন্তু সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন। কারণ ইচুর গ্রামে কেরোসিন অমিল, নুন দুষ্প্রাপ্য। সারাদিন নোয়ালি সর্দারের জমিতে কাজ সেরে ঝিঙে আর শশা নিয়ে

বাড়ি আসে ইচু। বাড়িতে এসে ভিজে ভাত খায় তেলের অভাবে ঝিঙে পোড়া দিয়ে, তাতেই খুশি সে। খেয়েই মড়ার মতো ঘুম। সকালে উঠে দেখে গ্রামের অনেক মানুষ ডাকাডাকি করছে। ভয়ে আশঙ্কায় সে কাঁটা হয়ে আগে নামাজ সারে, তারপরে জানতে পারে রেললাইনের ধারে পাওয়া গেছে তার বউ নিমির খণ্ডিত দেহ। কেউ তাকে হত্যা করে ফেলে গেছে। ইচু তার বিন্দুবিসর্গ জানে না। অথচ সন্দেহ তো তাকেই করছে সবাই। মাথায় হাত দিয়ে সে শুধু বলে, 'মুই কিচু বলতি পারিনে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মতো ঘুমুতি গেলাম।' আসলে তার বউয়ের দুশ্চরিত্রতা তার অজানা ছিল। ঘটনা বুঝে সারা গ্রামের লোক ইচুর পক্ষে দাঁড়াল। তার সততা ও ধর্মপ্রাণতা তাকে সকলের সন্দেহের উর্ধ্বে রেখেছিল। খুনী সন্দেহে তার আসন্ন গ্রেপ্তার এবং অবশ্যম্ভাবী হাজতবাসের কথা জেনে মোক্তারবাবুকে পায়ে ধরে বলল, 'বাবু, যেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ ওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়তে পারি—আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।'

দারোগা তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?'

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জানো এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

—আল্লার ঝদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু, তেনার যা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'কাকে কি বলছেন বাবু? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে নেই।'

ইচু মণ্ডলের মতো ধর্মপ্রাণ গ্রামীণ মানুষের চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। এ গল্পে বিভূতিভূষণ জোর দিয়েছেন নামাজী মানুষটার সততা ও ঈশ্বরাসক্তির দিকে। জাগতিক যে কোনো

ন্যায়-অন্যায়কে ইচু আল্লার মর্জি বলে মেনে নেয়; তার মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। কাজ করতে করতে সে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ভেবে আনমনা হয়ে পড়ে। অন্যমনা এবং ঈশ্বরে অনন্যমনা বলে দারিদ্র্যকে সে মানে না। কোনো জাগতিক কলুষ তার মনে নেই বলেই নিজের স্ত্রীর বহির্বৃত্তির সম্পর্কে তার সন্দেহ পর্যন্ত জাগেনি। যেটা লক্ষণীয় তা এই যে এমন একটা মানুষকে বিভূতিভূষণ জিতিয়ে দিয়েছেন। সারা গ্রামের খেটে খাওয়া গরিব মানুষ এই সৎ ও ধার্মিক মানুষটির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সাক্ষী দিয়েছে, নিজেদের খরচে নিয়ে গেছে ইচুকে শহরের মোক্তারবাবুর কাছে, থানার দারোগাবাবুর কাছে। সততার প্রতি গ্রামীণ আসক্তি, ভালো মানুষের সপক্ষে নিম্নবর্গের দলবদ্ধ হয়ে এমনভাবে দাঁড়ানো বিভূতিভূষণের গ্রাম সম্পর্কে একটা আলাদা বীক্ষণকে স্পষ্ট করে দেখায়।

দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ, কূট ও অমানবিক এখনকার গ্রামীণ গল্পের তুলনায় অনেক সহজ ও সাবলীল এই গ্রামসমাজ।

গল্পের শেষে দেখা যায় ঘর গেরস্থালীর সব জরুরি সরঞ্জাম ফেলে ইচু মণ্ডল বিবাগী হয়ে চলে গেছে। সুদূর খলসেখালি গ্রামে নদী তীরে তেঁতুল গাছের তলায় এক পর্ণ-কুটিরে কাহিনির শেষ দৃশ্য। সেখানে একজন ফকির হঠাৎ কোথা থেকে এসেছে। এক সন্ধ্যার ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। নামাজই তার জীবন। সবাই তাকে ভক্তি করে, মানে। তার নাম ইচু ফকির।

যে-পায়রাগাছির ফকির একসময়ে ইচু মণ্ডলকে আকর্ষণ করেছিল, তার সৎ জীবনের একনিষ্ঠ প্রবর্তনায়, সে নিজেই শেষপর্যন্ত সেই রকম একজন সর্বমান্য ফকির হয়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে শুকনো পাতা মলিন' কুসুমের মতো তার সাংসারিক পরিচয় ও গ্লানি। নিম্নবর্গের মানুষের এ হল উত্তরণের গল্প।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব গল্পের কথা বলা গেল তার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের জীবনপ্রবাহের গতি ও পরিণাম বিষয়ে বিভূতিভূষণের ভাবনা সমৃদ্ধ। মানুষগুলি নিম্নবর্গের। সমাজে তাদের তেমন মাননা নেই কিন্তু ধর্মে তারা আত্মস্থ। এখানে ধর্ম বলতে যার যার স্বধর্ম, সেটা সাম্প্রদায়িক

অর্থে নয়, যাপনগত নিজস্বতার অর্থে। যদু হাজরা মানুষটি ছাড়তে পারে না তার অভিনয়প্রবণতা, যদিও বদলে যায় দর্শকরুচি। ইচু ফকির ভ্রষ্ট হয় না তার পাঁচরোক্ত নামাজ পড়ার দৈনন্দিন সাত্ত্বিকতা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে, যদিও তার ধর্মপত্নী অবিশ্বাসিনী। বারিক মণ্ডলকে দমাতে পারে না উৎকট দারিদ্র্য ও সন্তান শোক। পাগলঠাকুর সরল নিষ্কপট জীবনযাপন, গান আর সেবাব্রতর মধ্যে তার হৃদ্‌কমলের পরমগুরু সাঁইয়ের কাছে নিজেকে উৎসর্জন করে দিয়েছে। গিরিবালার ঘোলাজলের উদ্দাম অসামাজিক ঘৃণ্য জীবন ক্রমে স্বচ্ছতোয়া হয়ে জনকল্যাণ ও লোকশিক্ষায় আত্মস্থ ও সানন্দ হয়েছে। এদের আর কোনো বহির্চাঞ্চল্য নেই। প্রবাহিত সমাজ সংসারের উথালপাথাল ঢেউ, লোভ, আল্লার প্রতি একনিষ্ঠতায় জমির কাজে আনমনা হয়ে পড়ে। সহকর্মী মুনিষরা তাই নিয়ে ঠাট্টা করে কিন্তু মানুষটাকে ভালোবাসে। বারিক মণ্ডল এত গরিব যে তার বর্ণনায় বিভূতিভূষণ লেখেন—

> বারিকের ঘরদোরের অবস্থা ছন্নছাড়া, চালের খড় গত বর্ষায় পচে ঝুলে পড়েছে,...
>
> গাড়ি গরু নেই।
>
> —গাড়ি গরু কি হল?
>
> —রামচরণ ময়রা গরু ক্রোক দিয়ে নিয়ে গেল, গাড়িও বিক্রি করে ফেলেচে আহম্মদ দফাদারের কাছে।

লেখক বিস্ময় মেনে ভাবেন,

> বারিক তাকে যখন বলে, 'আজ একবার মহল্লা ঘরে যাবেন বাবু ও-বেলা? দুটো গান শোনাতাম আর দেখতেন আমাদের সাধনসমর পালাটা কি রকম হল', ভাবেন,
>
> কে বলবে এই সেই বারিক, যার দুবেলা খাওয়া হয় না, যার গাড়ি গরু পর্যন্ত মহাজন ক্রোক দিয়েচে, দেনায় যার মাথার চুল বিক্রি, যার বয়স পঞ্চান্নর কোঠা ছাড়াতে চলছে। এই মহল্লায় ও একাই একশো।

এই সেই অপরাভূত উদ্বৃত্ত জীবনের আনন্দ। পান্তাভাত আর পটল

পেঁয়াজ-পোড়া-খাওয়া বারিক মণ্ডল, জাতে মুসলমান কিন্তু ছেলেকে কেষ্ট সাজিয়ে আনন্দ পায়। সেই ডাগর ছেলে মারা গেল।

শোকের সাতদিন না কাটতেই গোঁসাই বাড়ি থেকে জন্মাষ্টমীর রাতে শোনা যায় বাঁশি বেহালা ডুগিতবলার আওয়াজ। লেখক জানতে পারেন গোঁসাই বাড়ির নাটমন্দিরে বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্চে। বিভূতিভূষণ লিখেছেন : 'আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্চে।'

বাংলা সাহিত্যে এটাই একমাত্র লাইমলাইটের চ্যাপলিন চরিত্র।

বিভূতিভূষণের লোকায়ত প্রজ্ঞার অনুবিশ্বে ধরা পড়েছে আরেকরকম জীবনযাপনের তন্ময় উপাখ্যান। তা গড়ে উঠেছে ফালমন্ সাহেবের বিচিত্র বাগ্‌ধারা ও দেশীয়তায়। এককালে যশোহরের নীলগঞ্জে নীলচাষ ব্যবসায়ে এসেছিলেন বিলাতের বোর্নমাউথের লালমুর। নীলচাষ উঠে গেলে সাহেব এদেশেই থেকে যান।

> কামনা, মোহ এদের টলাতে পারে না আর, কেড়ে নিতে পারে না আনন্দ। সমাজের প্রতি এদের দায়বদ্ধতা দেখবার মতো।
>
> বারিক মহাব্যস্ততায় কখনো গান করে, কখনো এর গানের ভুল ধরে, ওর তালের ভুল ধরে, হাসি ঠাট্টা ও অঙ্গভঙ্গি কি ভাবে করতে হবে বিদূষকের ভূমিকায় তা শিক্ষা দেয়, ছেলেকে শিখিয়ে দেয় কৃষ্ণের ভূমিকায় কি রকম বেঁকে দাঁড়াতে হবে, এর দোষ ধরে, ওর গুণ গায়।

'পিদিমের নিচে' গল্পে পাগলঠাকুর ছুটে যায় সবার অধম দীনের হতে দীন বুনোপাড়ায় কলেরা রুগীদের সেবা ও ত্রাণের কাজে। বলে :

> —বাবাঠাকুর বুনোপাড়া উচ্ছন্নে গেল ওলাউঠোতে। রোজ সেখানে যাই, সারাদিন থাকি, এই খানিকটা আগে এইচি।
>
> —সেখানে কি কর?
>
> —আমি কি কিছু করি? তিনি—গুরুগোঁসাই করান। যার কেউ

নেই, আমার অকেজো হাত দিয়ে তিনি তাদের মুখে জল দেন, ওষুধ দেন। আমার হাত ধন্য হয়ে গেল। আমার হাত না দিয়ে অন্য কারো হাত নিলেই পারতেন। তেনার কৃপা।

গৌণধর্মের মগ্নসাধকের এই আত্মদীনতা ও ধন্যতাবোধের পাশে স্বারোপিত দায়িত্বচেতন গ্রাম্য লোকশিল্পী বারিক মণ্ডলের উক্তি লক্ষণীয়। সে বলে :

ওরা সব জেলে-মালো, বেতালা বেসুরো গান গাইত। হাতে-নাতে শেখালুম বাবু।

এ সব চরিত্রের মধ্যে একটা উদ্বৃত্ত আনন্দের ভাগ রয়ে গেছে। সেটাই তারা দান করে উঞ্ছজীবী খেটে খাওয়া মানুষের কাছে। মানুষের সংসর্গে আনন্দ পায় পাগলঠাকুর। বলে, 'আনন্দ করো, আনন্দ করবার জন্যেই এই একপাশে পড়ে আছি। গুরু গোঁসাইয়ের দয়ায় শুধু আনন্দ নিয়ে আছি।' গিরিবালাও নিশ্চয়ই তার জীবনের কোনো উদ্বৃত্ত আনন্দ ভাগ করে দেয় তার ছোটজাতের শিষ্যদের। সেই নির্ভয়তা থেকে তারা বলতে পারে, 'মোদের বিপদে আপদে সব উনি। ওনারে ছাড়া মোরা জানিনে। ছুটে ছুটে আসছি ওঁর কাছে। মা যা করেন।'

লোকায়তে এই প্রতিষ্ঠা দেখিয়া বিভূতিভূষণ মানুষগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেন। ঝিঙে পোড়া দিয়ে ভাত খাওয়া মরা গরিব ইচু মণ্ডল যান জমিদারি নিয়ে। এদেশেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। লালমুরের ছেলে ফারমুরের এদেশের মাটিতেই জন্ম-বিকাশ-কর্ম ও মৃত্যু। কেবল দেশীয় প্রজা ও গ্রামীণ মানুষের নিজস্ব উচ্চারণে তাঁর পরিচয় দাঁড়িয়েছিল লালমন্ সাহেবের ছেলে ফালমন্ সাহেব। কোথায় পড়ে রইল ইংলণ্ডের বোর্নমাউথ, লোকায়নের নির্মাণে, লালকমল-নীলকমলের মিথের জগতে, নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব হয়ে উঠলেন উচ্চারণের মতোই দেশীয়। গ্রাম্য মানুষ তাঁর নাম পাল্‌টে নিয়েছিল এটা তত আশ্চর্য নয়, আশ্চর্য হল ফালমনের মাটি মাখা জীবনপ্রণালী ও কথাবার্তার ধরন।

লেখক বাল্যকাল থেকে ফালমন্‌কে দেখেছেন সবিস্ময়ে সাহেবকে তিনি চিতলমারির খড়ের মাঠে আমীনের সাহায্যে জমি মাপতে

দেখেছেন, লোকজন নিয়ে নৌকোয় পটল কুমড়ো বোঝাই করতে দেখেছেন। খোদ সাহেবের মতো নির্মেদ পেটা চেহারা, পরনে ধুতি কিংবা কোর্টপ্যান্টের ওপর মাথায় তালপাতার টোকা। চল্লিশখানা গরু-লাঙ্গল, ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন কৃষাণ, আট দশখানা গরুর গাড়ি নিয়ে সাহেবের ছিল ফলাও চাষ-আবাদ। চাষীদের সঙ্গে ফালমনের সরেজমিন চাষ-তদারকির ডকুমেনটেশন শোনার মতো। সাহেব বলছেন :

—বাবলাতলার জমিগুলোন্‌তে দোয়ার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চাষ) দেবা কবে ও সোনাই মণ্ডল। তা দ্যাও। আর দেরি করবা না। রস টেনে গেলি ঘাস বেধি যাবে আনে। তখন লাঙ্গল বেশি লাগবে। এখনো ভুঁইতে রস আছে।

—বাবলাতলার ভুঁইতে পানি আর কনে, সাহেব? কে বল্লে আপনারে?

—নেই? কাল সাঁজের বেলা আমি আর প্যাট (সাহেবের শালা) যাইনি বুঝি? ঝা পানি আছে তাতে কাজ চলে যাবে আনে।

—ছোলা কাটতি হবে এবার।

—এখনো দানা পুরুষ্টু হয়নি, আর চার পাঁচটা রোদ খাক্। সময় হলি ব-অ-ল-বো—

ফালমন সাহেবের জীবনযাপনের ছন্দে রূপ ও রসের যুগল সম্মিলন দেখার মতো। বাংলার শস্যপূর্ণ জমি-জিরেতের নিজস্ব রূপ, তার রৌদ্র-বৃষ্টি-জাড়ের প্রাকৃতিক লালন যেমন সাহেবের নখাগ্রে, তেমনই গ্রামীণ লোকজীবনের রসবিলাস ফুটে ওঠে যখন গোপেশ্বর বৈরাগীকে তিনি মাঠ থেকে হেঁকে বলেন, 'ও গোপেশ্বর, শোনো, একটা কৃষ্টবিষয় গান করে শুনিয়ে দাও দিকি?'

—কৃষ্ট বিষয়?

—কিংবা শ্যামাবিষয়। না, তুমি বোষ্টম টুম টুম আবার বুঝি শ্যামাবিষয় গাইবা না। ঝা মন চায় একখানা শোনাও। বড্ড রোদ পড়েছে, শরীলির কষ্ট হয়েচে বড্ড। বসো, এই পিটুলিতলার ছায়া পানে।

সারা দেশের প্রবাহিত জনসমাজ ও ধর্ম-উপধর্মের বিন্যাস সম্পর্কে ফালমনের জানাচেনা তাঁর জোতজমি বিষয়ে সরেজমিন জ্ঞানের বহর প্রাকৃত লোকের মতো প্রখর ও নিখুঁৎ। 'কানুবিনে গীত নাই'-য়ের দেশে কৃষ্ট বিষয়ে গাইতে বলা কত স্বাভাবিক, আবার জাতবৈষ্ণব গোপেশ্বর বৈরাগী যে শ্যামাবিষয় গাইবে না সে সম্পর্কে দেশজ রীতিপদ্ধতির নিজস্ব প্রান্তিকতার জ্ঞান ফালমন চরিত্রের অপরূপ অনন্যতা। এমন কি 'বোষ্টম টুম টুম'[১] উচ্চারণের লৌকিক ব্যঙ্গ পর্যন্ত তাঁর আয়ত্তে। বিভূতিভূষণ '*নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব*' গল্পে এক বিরল সিদ্ধির পরিচয় রেখেছেন। গ্রাম সমাজে জন্মে সেই সমাজপরিবেশে বড় হয়ে উঠলে একজন বিদেশিও কেমন করে লোকবিশ্বাস, লৌকিক বুলি ও লোকায়ত বিন্যাসের অন্তর্গত হয়ে যান এই গল্প তার অসামান্য উদাহরণ। আমাদের মনে পড়ে কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কথা, কিন্তু তিনি বাংলায় কবিগান বেঁধে গাইলেও লোকায়ত বিন্যাসের অন্তর্গত হতে পারেননি। কারণ জমির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। অথচ ফালমন্ ছিলেন একজন সচ্ছল কৃষিজীবী। জল আর মাটির কাছ থেকে সবচেয়ে নিবিড় ও অনুপুঙ্খ দেশীয়তা শেখে মানুষ। ফালমন্ সেই জল-মাটি-পরিধির মানববিন্যাসে এ দেশকে পেয়েছিলেন আপন অন্তরে। তাতে কোনো আড়াল ছিল না এবং তাঁর এই দেশপরিচয় আদ্যন্ত অনুরাগে লব্ধ। সেই জন্য গোপেশ্বর যখন গায়, 'কোন্‌টি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে', তখন সাহেব হাততালি দিয়ে সোচ্ছ্বাসে জানতে চান—

—বাঃ বাঃ—বেশ গলা—দাশু রায় না নীলকণ্ঠ?

—নীলকণ্ঠ।

—দাশু রায় একখানা হোক না।

এই অনুরোধে গোপেশ্বর গায়, 'ভয়ে আকুল বসুদেব দেখে অকূল যমুনা', তখন চোখ বুজে পুরো গানটা শুনে ফালমন্ গায়কের পিঠ

---

১. মূল ব্যঙ্গাত্মক ছড়াটি : বোষ্টমা টম টম
ঝুলির মধ্যে মুরগি রেখে
মাংস খাওয়ার যম।

চাপড়ে দিয়ে বলেন,

'বাঃ বাঃ—দাশু রায়ের গানের কাছে আর-সব কিছু লাগে না। কি রকম—কি ওরে বলে রে গোপেশ্বর?'

—অনুপ্রাস?

—ওই যা বললে। ভারি চমৎকার, লাগতিই হবে যে। দাশু রায় হুঁঃ

ফালমনের সংলাপ থেকে বোঝা যায় বাংলা গান বিষয়ে তাঁর সমজদারি সাহেবি নয়, লোকসমাজের ঘনিষ্ঠ সংসর্গ থেকে স্বতঃ অর্জিত। তা যেন রক্তগত উত্তরাধিকারের মতো সাবলীল। কথাটা পাকাপোক্ত হয় যখন পরে জানা যায় যাত্রাদলের গোপাল পাইকের গান শুনে খুশি হয়ে সাহেব তাকে এস্টেটে চাকরি দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ বিষয় বা শ্যামা বিষয়ে গান শোনার মর্জি হলেই গোপালের ডাক পড়ত। তাঁর এই লৌকিক গানের নেশা পোষাকি ছিল না।

ফালমানের লৌকিক সংস্কৃতি বিষয়ে অনুরাগ ফুটে ওঠে এই বর্ণনায়, যে, 'বারোয়ারি যাত্রার আসরে ফালমন্ সাহেব সকলের সামনে চেয়ার পাতিয়া বসিতেন। যাত্রাগানের অমন ভক্ত দুটি দেখা যাইত না।' বেহালাদারদের নির্দেশ দিতেন। আর কৃষ্ণ সেজে আসরে কেউ এলেই ঘোষণা করতেন, 'এই যে ছোঁড়াডা কৃষ্ট সেজে এসে গানখানা করে গেল, ওরে আমি একটা রুপোর মেডেল দেবো।' এছাড়া আসরে কোনো করুণ ভক্তিরসের প্রসঙ্গ এলেই ফালমন্ সকলের সঙ্গে বলে উঠতেন, হরিবোল হরিবোল। রক্ষাকালী বা শীতলাপূজায় চাঁদা দিতেন উদার হাতে।

আভিজাত্যগর্বী ইংরেজসন্তানের এমন চমকপ্রদ গ্রামীণ বিন্যাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর বিভূতিভূষণের সৃষ্ট লোকায়ত অনুবিশ্বের এক মরমিয়া আবিষ্কার। সন্দেহ কি যে গল্পের পরিণামে ফালমন্ বলবেন, 'এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলাডায় কবর দিও। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবে'। এই অন্তিম সংলাপে ফালমনের চরিত্র বৃত্তাকার পূর্ণতা পেয়ে যায়।

লোক লৌকিক বিশ্বাসের জগৎ ব্যেপে বিভূতিভূষণের যে আখ্যান পরিক্রমা তার সবশেষে বলা যায় '*বুড়ো হাজরা কথা কয়*' গল্পটির কথা। গল্পের কাহিনিবিন্যাস বা বিস্তারের বিবরণে যাবার প্রয়োজন নেই। শুধু সাঁটে বলা চলে এ-উপাখ্যান পাঁচ বছর বিবাহিত উদ্ধব দাস ও পাঁচু দাসীর সন্তানহীনতার বেদনা দিয়ে শুরু। নিশেনখালির হাজরাতলায় তারা যাচ্ছে সন্তানকামনার মানসিক নিয়ে। অনেকেই যাচ্ছে পাঁচু দাসীর মতো, ইতরভদ্র, শহুরে ও গ্রামীণ। সংস্কারের তো কোন ভেদরেখা নেই। ব্যাং নদীর ধারে হাজরাতলার মাঠ। মাঠের মধ্যে চারধারে প্রাচীন গাছের সারি। 'সেই ষাঁড়াঝোপের বেড়ার ধারে একটা বড় ষাঁড়া গাছই হচ্চে হাজরাতলা, বৃদ্ধ হাজরা ঠাকুরের স্থান।'

পুরোহিত জানান, স্নান করে ভিজে কাপড়ে হাজরাতলায় আঁচল পেতে বসতে হবে।

> একজন বল্লে,—কতক্ষণ বসে থাকবো বাবাঠাকুর?
>
> —চোখ বুঁজে বসবে সবাই। যতক্ষণ না আঁচলে কিছু পড়ে ততক্ষণ বসবে মা তোমরা। চোখ চেও না কেউ, আসন ছেড়ে উঠে পড়ো না যেন অধৈর্য হয়ে।

সংলাপের টানে ক্রমে পাঠক জেনে যান যে, আঁচলে ষাঁড়াফল পড়লে সন্তানজন্ম হবে, চুল বা ঢিল পড়লে তার পোড়া কপাল।

গ্রাম্য কুসংস্কারের কাহিনি, যা লোকলৌকিকের সীমানা পেরোতে পারে না। শিক্ষিত শহুরে পাঠকের মনে ছাপ ফেলবারও কথা নয় এ-আখ্যানের। কিন্তু বিভূতিভূষণ চমকে দেন একেবারে শেষে। ষাঁড়াফল প্রাপ্তির সৌভাগ্য নিয়ে উদ্ধব ও পাঁচু দাসী পার হচ্ছে খেয়া। গল্পের শেষ কটি পংক্তি এই রকম :

> সূর্য অস্ত যাচ্ছে ব্যাং নদীর পশ্চিম গায়ে বনজাম আর হিজল আর বেতঝোপের আড়ালে। পাঁচু দাসীর মন আনন্দে ভরে উঠলো হঠাৎ। খোকা আসছে, হাতে তার বীজবেগুন, কত ক্ষেতে ক্ষেতে শক্ত হাতে সে লাঙ্গল দেবে, বেগুনের চারা তুলে পুঁতবে হাপর থেকে, সোনা ফলাবে মাটির বুকে। সে আসছে।

চাষী বউয়ের সন্তানকামনার সঙ্গে বীজবেগুন হাতে শক্ত সমর্থ পৌরুষভরা চাষের ধারাবাহিকতার স্বপ্ন আমাদের বিহ্বল করে দেয়। শিক্ষিত উচ্চবর্গের মানুষ বিভূতিভূষণ জলমাটির স্পর্শে সন্তানের বীজ আর বীজবেগুনকে একত্র করে যে-স্বপ্ন গড়েন তা তাঁর লোকায়ত অনুবিশ্বের মতো গোপন ও সংবেদনময়। মন ছলছল করে ভেবে যে, এমন একটা সমৃদ্ধ কৃষিজীবনের পরম্পরার স্বপ্ন কেমন করে দেখলেন এই ভদ্রবংশজাত ব্রাহ্মণ?

দারিদ্র্যের কারণে গোবিন্দ মুচি তার গরু বেচে দেয় বুধনের কাছে, তিনশো টাকায়। একমাত্র গরু। বুধনকে খবর দিয়েছিল খড়ু। গরুর দালালি করা তার পেশা। তার চোখে 'শকুনের দৃষ্টি'। গোবিন্দর গোয়াল থেকে বেচে-দেওয়া-গরু টেনে বার করছে খড়ু। তার বর্ণনা পুরুলিয়াবাসী সৈকত রক্ষিতের কলমে :

> গলাসি হাতে পাকিয়ে সদরের বাইরে থেকে খড়ু গাইটাকে টানতে থাকে। ফাঁসে জোর টান মেরে বলে, হিঁর্‌র্‌র্‌-র‍্যাঃ। টাইক-টাইক-টাইক। শ্বশুর ঘরে যাতে মন নাই করছে? হ্যাঁ? নাই করছে? বিঁর্‌র্‌র্‌-র‍্যাঃ। রাস্তায় নেমে, খড়ুর আর ফুর্তি ধরে না। গলাসিটা সে কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের কাছে জড়ো করে ধরেছে। সবার আগে আগে সে-ই লম্বা পায়ে, এগিয়ে যায়। লাপট্‌ লাপট্‌ করে। আর ডান হাত শূন্যে উড়িয়ে গাইতে থাকে :
>
> এতদিন যে খালিস বাছা
> বঝা বঝা ঘাস রে...

দেশচরা মানুষ হারাই রাঢ় মুলুকে এসেছিল সম্পন্ন চারু মাস্টারের বাড়ি দু-বস্তা কলাই আর বড় বড় কুড়িটা কুমড়ো দিতে। বহুদূরের দেশ থেকে গরুর গাড়িতে এসে সে চারুবাবুর বাড়ি দুটো রাঢ়ী চালের ভাত খায় পেটপুরে। ভাত তাদের কাছে স্বপ্ন। সারা বছর তারা তবে কী খায়?

> 'ইয়া মোটা মাসকলাই আটার লাহারি। ছাতু। ভুজা। গেঁহু উঠলে দু-মাস সুখ। আম কাঁঠালের সঙ্গে গেঁহুর আটার চাপড়ি। আমার যে কষ্ট, জানোয়ারের কষ্ট। বাঁওয়ালি বলদটার হালগতিক খারাপ।'

বাড়ি ফেরার পথে এই বাঁওয়ালি বলদটাকে আর টেনে তুলতে পারে

না হারাই। অসুস্থ গরু নারাজ, অক্ষম। মুর্শিদাবাদের লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা বর্ণনা :

> হারাই বাঁওয়ালি বলদটাকে ওঠাতে ব্যস্ত। —ইর্‌র্‌র্‌ হেট্‌ হেট্‌ হেট্‌! হিঁই। দেখছ, দেখছ? হুঁ হুঁ! সে লেজ ধরে টানাটানি করে। গর্জায় বারবার।—দুশমন! জোভিয়া : (জবাইযোগ্য)। জবাই করব বলছি হুঁ। উঠল? উঠল এখন? তারপর একটু ঝুঁকে আদুরে স্বরে—হামার বাপধোন রে! সোনরে! মানিক রে! এটুকুন কষ্ট কর্‌ বাছা! সানকিডাঙা পজ্জন্ত গেলেই খালাস। ইর্‌র্‌র্‌ হেট্‌ হেট্‌!

বাংলা গল্পের লোকায়তিক স্বভাব বোঝাতে দুটো বর্ণনা বেছে নিয়েছি। না, এটা কোনো গুরুগম্ভীর নিবন্ধের পূর্বালাপ নয়। শুধু বোঝানোর চেষ্টা যে, কত সহজে, অনায়াসে, দক্ষ লেখকের কলম চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে নিজস্ব দেশীয়তা। গরুর গলার 'গলাসি' শব্দটা শেখা গেল। গরুর গাড়ির বাঁদিকে জোতা হয় যে-বলদ তার নাম 'বাঁওয়ালি'। ডানেরটা 'ডাইনালি' পরে জানা যাবে গল্পের টানে। পুরুলিয়ায় যেটা 'হিঁর্‌র্‌র্‌ র‍্যাঃ টাইক টাইক টাইক' মুর্শিদাবাদে সেটা 'ইর্‌র্‌র্‌ হেট্‌ হেট্‌ হেট্‌, হিঁই'।

এই পর্যন্ত না হয় আঞ্চলিক উচ্চারণ বা দেশী বুলি। কিন্তু সৈকতের গল্পে যখন গরুর দালাল খড়ু বলে —'শ্বশুর ঘরে যেতে মন নাই করছে? হ্যাঁ? নাই করছে?' তখন অসহায় এক পারিবারিকতা উঁকি দেয়। গাভী যেন বাড়ির মেয়ে, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই গোবিন্দ মুচি তাকে বেচে দেয় তিনশো টাকায়। নিজের অদৃষ্টকে উপহাস করে গোবিন্দ আগেই একবার বলেছে : 'মুচির ঘরে ভগবতী থাকবেক ক্যানে? আজ হোক কাল হোক ইয়াকে বিদায় না করলেই লয়।'

মুস্তাফা সিরাজের গল্পের হারাই বাগড়ী অঞ্চলের মানুষ। বলদ জোড়া তার নিজের সন্তানের মতো। তাদের বিক্রি করা অসম্ভব তার পক্ষে। সে বাঁওয়ালি বলদ ধনাকে ডাকে 'বাপ ধনা' বলে। আরও বলে, 'সেই ছুটো থেকে মাগমরদে পেলেছি, তু—আমারঘে বেটা। হামারঘে কলিমদ্দি ছলিমদ্দি আসিরদ্দি যেমন ব্যাটা, তোরা ধনা-মনাও হামারঘে দুই ব্যাটা।' সন্তানের মতো সেই ধনা যখন অসুস্থ হয়ে অচল হয়, তখন হারাই তাকে

গাল দেয় 'জোভিয়াঃ'। প্রাণের সন্তানকে যেন বলে, 'জবাই করব বুলছি হুঁ।' এই একটি মাত্র সংলাপ থেকে বোঝা যায় হারাই মুসলমান। গরুর সঙ্গে তাদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক—একদিকে পাল্য-পালক আরেকদিকে খাদ্য-খাদক। গল্পের শেষে, ঘটনাচক্রে, নিয়তির মতো, হারাই তার সন্তানোপম ধনার মাংস ভক্ষণ করে অজান্তে। গভীর ক্ষোভে বলে ওঠে 'হামাকে হারাম খাওয়ালেন!' হারাম কেন? সে-তো 'পরোজি' (মুসলমানদের মধ্যে যারা গরু খান না) নয়। রোষে দুঃখে কান্নায় সে বলে, 'হামাকে হামারই বেটার গোশ্‌তো খাওয়ালেন! হেই হাজিসাব! হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গে! এক-পক্ষর পানিতেও ই আগুন নিভবে না গো।'

দলিজ ঘরের নিচে আলো-অন্ধকারে হারাই 'জবাইকরা প্রাণীর মতো' ধড়ফড় করে।

উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের জীবনপ্রণালী ও প্রক্রিয়ার যে-ব্যবধান তাকে ধরতে চাইছেন আধুনিক গল্পকাররা। যিনি যতটা ধরতে পারছেন তাঁর গল্প ততটাই বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। কাজটা কঠিন। উচ্চবর্গের জীবনভিত্তি আর বিশ্বাস দিয়ে লোকায়তকে বোঝা যায় না। সেইজন্য লেখককে একেবারে অনুভূমিকভাবে প্রবেশ করতে হয় লোকজীবনে। সেঁধিয়ে যেতে হয় তার মধ্যে। যিনি তা পারেন না তাঁর লেখা নিরক্ত, বানানো, সাজানো মনে হয়। যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে জনজীবন, গ্রামজীবন ও লোকায়ত জীবনের কাহিনি রচনার দিকে একটা সচেতন ঝোঁক এসেছিল। সেটা প্রবণতাগতভাবে বরণীয়, কিন্তু সিদ্ধির বিচারে সংশয়িত। সারাজীবন শহুরে চর্যার মধ্যে থেকে গ্রামের কাহিনি বিশ্বাসযোগ্য করা কি সহজ? তার জন্য খুব বড় মাপের কল্পনা ও সৃজন ক্ষমতা লাগে এবং অন্তত বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা দরকার হয়। মেটেঘর, দাওয়া, গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনা, গ্রাম্য ঘোঁট, ম্যালেরিয়া, অস্বাস্থ্য, পানাপুকুর কিংবা ছিদাম-চন্দরা-আইনদ্দি-পাঁচু নাম দিলেই কি লোকায়ত ধরা যায়? যায় না, কারণ শেষতক সেগুলি হয়ে যায় ব্যক্তির কাহিনি, একক ও বিচ্ছিন্ন। অথচ লোকায়তের কাজ সকলকে নিয়ে। তাই বলে গ্রামীণ চর্যার মধ্যে বসবাস করলেই যে লেখকের রচনায়

লোকায়ন জেগে উঠবে উজ্জ্বল হয়ে তাও নয়। কারণ গ্রামে থাকা মানেই তো গ্রামকে জানা নয়, যেমন শহরে থাকলেই মানুষ নাগরিক: চেতনা সম্পন্ন হবেই এমন কথা নেই।

রুরালিটি আর আরবানিটি দুটো আলাদা চেতনা। শক্তপোক্ত প্রখর আরবান কোন মানুষ তার নাগর-পরিশীলন-সত্ত্বেও নির্ভুলভাবে লোকায়তকে সনাক্ত করতে পারেন। অন্য পক্ষে আজীবন লোকায়ত বহতা স্রোতের পাশাপাশি বাস করেও, অন্ধভাবে জীবনধারণ করতে করতে, হারিয়ে যায় চমকপ্রদ দৃশ্য বর্ণ গন্ধ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় নিসর্গের আহ্বান। জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণের মূল দৃষ্টিভঙ্গি আরবান এবং পরিশীলিত, অথচ তাঁদের দুজনের রচনার অন্তর্গত গ্রামীণ খুব বিশ্বাসযোগ্য ও বর্ণনাবহুল। তার কারণ, চোখ দিয়ে নয় শুধু, সমগ্র সংবেদন দিয়ে তাঁরা গ্রামকে ছেঁকে নিয়েছিলেন। যেন একটা পর্যুষিত মানসতা, কম্পিত ও গভীর। তাঁদের কবিতা ও গল্পে কোনো ছল নেই, অথচ গ্রামকে চেনাচ্ছি এমন আত্মঘোষণাও নেই।

গ্রামজীবনের ব্যাপক ও সানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আবদুল জব্বার ভাল গল্প লেখক হতে পারেননি এই সংবেদনের অভাবে। *বাংলার চালচিত্র* বইখানির ডকুমেন্টারি দিকটা সকলেই মেনে নেন, কিন্তু জব্বারের কাহিনি রচনার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। অথচ মুস্তাফা সিরাজের দেখা-শোনা-জানা জব্বারের চেয়ে কম নয় কিন্তু তিনি ডকুমেন্টারি ফিচার লেখেননি, গল্প লিখেছেন। তবু তাঁর রচনায় ডকুমেনটেশন কি কিছু কম? একটা নমুনা :

> প্রথম প্রহর শেষ হলে আদাড়ে শেয়াল ডাকে। লম্ফ হাতে পাটকাঠির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে তার বউ আর ঘুম ঘুম চোখে ছেলেমেয়েরা—প্রত্যেকটি মুখে প্রত্যাশা ঝকমক করে। বাপ ফিরে এলে রাঢ়ী মিঠা ধানের ভাত খেতে পাবে। যে-ভাত পালায়-পরবে খায় মোল্লাজীরা, মিয়াসাহেবরা, বাবুমশাইরা। সেই ভাত—সাদা ঝকঝকে মিহি স্বাদু 'শাহ্‌দানা'। মোল্লাজী বলে শাহ্‌দানা। শ্রেষ্ঠ দানা বা শস্য।

একেই হয়ত সাব-অলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গি বলা চলে। নিম্নবর্গের চোখে অন্য জীবনের স্বাদ গন্ধ বর্ণের পরিবেশন। খাদ্য-খাদকতা লোকায়ত যাপনের একটা সুনিশ্চিত পরিমাপ। সিরাজের 'গোয়' গল্পে যে ট্র্যাজেডি তা উচ্চবর্গের চোখে ধরা পড়েনি। কারণ উচ্চবর্গ তো সন্তান-স্নেহে গোপালন করে না।

গোপালন, গোখাদ্য সংগ্রহ, গরুর ব্যাধি, গোবদ্যি, গোহত্যাজনিত পাপ—এসবই গায়ে গায়ে লেগে থাকা সংস্কার, গ্রামজীবনে। বাড়িতে নতুন গরু এলে বাড়ির বউ তাকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে অভ্যর্থনা করে, ভগবতী যাত্রায় হয় গোয়াল পরিচর্যা আর সেই গোয়ালেরই এক কোণে পরমান্ন রান্না। সংসারে গোমাতার আগমন আর অবস্থান যেমন কল্যাণের, তাকে বিদায় দেওয়া তেমনিই সন্তাপের। গোমাতার শুশ্রূষা সর্বদা জরুরি। সংসারের অবশ্যবান্ধব তাই গোবদ্যি। '*গোয়*' গল্পে গোবদ্যি পিরিমল এক অনবদ্য চরিত্র এবং আগাগোড়া বিশ্বাস্য। উপভোগ্য তার ও হারাইয়ের সংলাপ। অসুস্থ গরু ধনাকে দেখিয়ে 'হারাই কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—বিষম বিপদ। চন্ডী তলার চারু মাস্টের বললেন...

—বুঝিছি। শিসটানা না বাঘ তড়পা? মুসকো না ছ্যারানি?

—ছ্যারানি।'

এ-জগতে প্রবেশাধিকার তো সহজ নয়, সহসাও ঘটে না। অনুভূমিক ভাবে লোকায়ত যাপনের অন্তঃস্তলে না সেঁধোলে এমনতর অভিজ্ঞ লেখা যায় না।

যাই হোক, পিরিমল গোবদ্যি পথে 'যেতে যেতে তিনপুরুষের নামধাম, গরু দুটোর জীবনচরিত জেনে নেয়। তারপরে অর্জুনতলায় গিয়েই লাফিয়ে ওঠে—এঃ হে হে হে হে! করিছিস কী! ওরে ফুটুকচাঁদা! ওরে বাঘড়ে ভূত! এইখেনে গাড়ি বেঁধিছিস? হায় হায় হায় হায়! আবাগীর বেটা করিছে কী গো!'

যেখানে গাড়ি বেঁধেছে হারাই সেখানে একদা কালুদিয়াড় গাঁয়ের ইসমিল আত্মহত্যা করেছিল। 'হারাই শিউরে উঠে তাকায় শুধু। মন কেন খালি কু গায়।'

ব্যস। এখান থেকেই গল্প তার গতিপথ পেয়ে যায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত অসহায় পল্লিবাসী কুসংস্কার তুকতাকের সর্পিল পথে চ্ছন্ন হয়। ক্রমান্বয়ে এক নিশীথ রাতের অভিযানে হারাই দেখে গ্রহবৈগুণ্য ও প্রেতচ্ছায়া। গরুর দালাল দিলজানকে মনে করে শয়তান আজরাইল। সমস্ত গল্পটাকে পেঁচিয়ে ধরে এক ভাবী আশংকা ও আসন্ন দুর্বিপাক। লোকায়তিক সংস্কার গল্পে ছায়া ফেলে। এ গল্প শহরের নয়। শহরবাসী লিখতে পারবেনও না এমন গল্প।

সৈকত রক্ষিতের '*হাম্বা*'-ও এক গরুবিষয়ক গল্প কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের। এ-গল্প গোবিন্দ মুচির, যার ছেলে হারাধন, স্ত্রী চঞ্চলা। খিদের চোটে ভিন গাঁয়ে একবার কৌশলে একটা মুরগি চুরি করতে গিয়ে গোবিন্দ হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। সেই থেকে তার গাঁয়ে ও আশেপাশে তার নাম হয়ে যায় 'মুরগি চোর'। পুরুলিয়া অঞ্চলের কুলহু, ধাদ কি ডি, পাঁড় কি ডি, বৈরারপুর গ্রাম বেড়ে গোবিন্দের ধান্দার জীবন অর্থাৎ গরুর চামড়া আর শিং কেনাবেচা। অথৈ দারিদ্র্য। মাঝে মাঝে এক-আধবেলা মুনিষ খাটা, অবরেসবরে গোবদ্যির কাজ। সেই সুবাদে মরণাপন্ন গরুর কাছেভিতে থাকে সে, মরলে চামড়া শিং কিনবে। তবে কথা হল, 'এই আকালে গাই-গরু আর কে পুষছে? মানুষের পেট চলছে নাই, ত জানুয়ারের পেটে কী দিবেক?' তাকে তাই মাঝে-মাঝে ভর করে নির্বেদ। সে গায় :

'পথের সম্বল হরিনাম
কিঞ্চিকও না লিলি
অ-মন
ই-ভবসংসার ছাইড়ে যাবি...'

এই তার প্রাত্যহিক, দিনানুদৈনিক।

মাঝে মাঝে গোবিন্দ ঝুমুর গায় অন্যের উপরোধে, কিন্তু এত করেও তা হা-অন্ন দিন প্রসন্নতার মুখ দেখে না। তার উপার্জনশীল জীবনের সবকটা পথ ক্রমশ লুপ্ত ও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক-জোড়া শিংই বা সংগ্রহ করতে পেরেছে? মরা গরুর চামড়া ছাড়িয়ে যে-শ্রম সে এতকাল দিয়ে

এসেছে, তার বিনিময়ে সে পেয়েছে কতটুকু? তাছাড়া গরু-বকরি মরেও তো কম। বেশি মরে মানুষ।...মানুষের চামড়ার কোনো কিমত নেই।'

শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক অভাবে ও ক্ষুধায় গোবিন্দ তার একমাত্র গরুটা বুধন রজককে বেচে দেয় তিনশো টাকায়। তারপরে স্বভাবকুঁড়ে মানুষটা নিষ্কর্মা নিশ্চিন্তিতে বাড়ি বসে সব টাকা ফৌৎ করে দেয়, উপরন্তু চঞ্চলা আবার সন্তানসম্ভবা হয়।

সৈকতের গল্পের নায়ক গোবিন্দ পুবের আকাশে চঞ্চলার মতো স্ফীতোদর মেঘ দেখে কিন্তু প্রত্যাশিত বৃষ্টির বদলে আসে মাটি চৌচির খরা। 'দিগন্তজোড়া এক হাহাকার যেন গ্রামের পর গ্রাম ধরতে চায়।' অগত্যা ভুখপীড়িত শীর্ণ সন্তান বলরামকে নিয়ে গোবিন্দ হাঁটাপথে যায় পাঁচক্রোশ দূরের বলরামপুরের দিকে।

—কুথায় যাবা বাবা? কন্ গাঁয়ে?

—গাঁয়ে লয়। শহরে যাব। বললামপুর।

—শিং পাওয়াবেক, বললামপুরে? হ্যাঁ বাবা—?

—ভিক মাঙতে যাচ্ছি ব্যাটা। বললামপুরে বহুত বড় বড় দকানদানি আছে। ভিক মাঙলে খাবাদ-দাবাদ ইটা সিটা পওয়াবেক।

—আমিও মাঙব? হ্যাঁ বাবা?

কিন্তু ভিক্ষা সে করে না। তার ভেতরের অভিজ্ঞ ঝুনো বুদ্ধির মানুষটা অন্য কৌশল বাতলায় তাকে। গরু বাঁধা দড়ির ফাঁসটা মাথায় গলিয়ে নেয় গোবিন্দ। 'পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি, খালি গা আর গলায় পাঘা বাঁধা। তার ওপরে খোশের জন্য খামচে খামচে কাটা মাথার চুল—সব মিলিয়ে গোবিন্দকে এখন জঙ্গলের কোনো পশুর মতো লাগে। শান্ত ও নিরীহ এই পশুটির চোখে ঘৃণা বা বিস্ময়ের কোনো ইঙ্গিত নেই। নেই পারিপার্শ্বিক নিয়ে কোনো অভিযোগ। দুচোখ জুড়ে তার কেবল বেঁচে ওঠার শেষ এবং সকাতর অনুনয়।'

> দোকানের সামনে গোবিন্দ গরুর মতোই ডাক দিয়ে ওঠে—'হাম্বা', অর্থাৎ ঘরে তার গরু মরেছে। মরেছে এমনি গলায় দড়ির ফাঁস লেগে। তারই পাপ ঘর্শেছে গোবিন্দর ওপর।

এইভাবে পাশব-বুদ্ধি মানুষের ওপর ভর করে। মানুষ হয় পশুর মতো। ভুখা মানুষ কোনো সহজ উদরপূরণের পথ না পেয়ে লোকবিশ্বাসের এমন এক দুর্বলতার সুযোগ নেয় যাতে মানুষের তার প্রতি করুণা জাগে, অনুকম্পা জাগে। এই কৌশলটাই জন্মত গ্রামীণ, লোকায়ত। গাঁয়ে সবাই জানে, বিশ্বাস করে যে, কোনো মানুষের গোয়ালে গলায় দড়ির ফাঁস লেগে যদি আকস্মিকভাবে গরু মরে তবে সেই মানুষ গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা করে সেই অর্থে গরুর শ্রাদ্ধ করে। তবে পাপের মুক্তি ঘটে। এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে লোকায়তিক জীবনের মানুষ অতি দুর্বল। তাই স্বতই গোবিন্দর প্রতি বলরামপুরের দোকানদারদের সহানুভূতি থাকার কথা। সে সেই সুযোগটা নিয়ে দোকানে দোকানে ফেরে, ছেলের হাত ধরে, বলে 'হাম্বা'। হ্যাঁ, এ অবস্থায় মানুষের রা কাড়তে নেই। চমৎকার গল্প সাজিয়েছেন সৈকত, লোকায়ত বিশ্বাসের জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট পৃথক ধারণা থেকে এ গল্পের সৃষ্টি।

'গো-ভৈদা' বলে এই অবস্থাকে, পুরুলিয়া অঞ্চলে। সত্যি সত্যি সে গো-ভৈদা কিনা তা জানতে সতর্ক ও সংশয়ী এক গ্রামবাসী ছাতা বগলে এসে সামনে দাঁড়ায় তার। জিগ্যেস করে, 'গো-ভৈদা হয়েছিস, লকি হে?'

সৈকত চমৎকার লিখেছেন এ প্রসঙ্গে :

> গোবিন্দও কম চতুর নাকি? সে জানে নিছক অসতর্কাবশত মুখ ফসকে কথা বলে ফেললেই তার ভন্ডামী ধরা পড়ে যাবে।
>
> সাইকেল মিস্ত্রি পকেটের খুচরো পয়সাটা দিতে গিয়েও বলে, 'দিব? কিন্তুক তার আগে তোকে রা কাড়তে হবেক।'
>
> 'হাম্বা'।
>
> ক্রমে ক্রমে জমে যায় থলিতে সের দু-আড়াই চাল, গোটা আষ্টেক টাকা। হাত পাতলে আরও কিছু যে মিলে যাবে তা বুঝে গোবিন্দর আনন্দের সীমা নেই। তিনদিনের খোরাক সে জোগাড় করে ফেলেছে। স্বভাবনিষ্কর্মা কুঁড়ে মানুষটার এমনতর তৎপরতায় বউ চঞ্চলা কতটা যে চমকে যাবে এই যখন ভাবছে গোবিন্দ তখন

একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে কৌতূহলী হয়ে বলে, 'পাথর-ডি-র লোক? গো ভৈদা হয়েছে?' এগিয়ে এসে গোবিন্দকে দেখে বলে, 'গোবিন্দদাদা, কবে তোমার গাই মরল?...কবে তুমি গাই কিনলে আর কবেই বা মরে গেল? আমি জানতেই লারলি? হ্যাঁ গোবিন্দদাদা?'

নিয়তি এমনই যে গোবিন্দকে যে চিনে ফেলে সে খড়ু, যার হাত দিয়ে তার গরু বিক্রি হয়েছে কিছুকাল আগে। গোবিন্দর সকাতর ইশারা খড়ু বোঝে না। ইতিমধ্যে ভিড় দেখে আরেকজন কৌতূহলী এগিয়ে এসে পানের পিক ফেলে গোবিন্দকে চিনতে পেরে বলে ওঠে—'ইতো মুরগি চোর বটে। গো-ভৈদার ভেক ধরেছে?'

এরপরে সত্যি সত্যি গোবিন্দর ভেক খসে পড়ে, বেরিয়ে পড়ে অসহায় ক্ষুৎকাতর এক অভাবী মানুষের করুণ সত্তা। ছেলেকে নিয়ে সে দৌড়ে পালাতে থাকে, 'প্রকৃত মুরগিচোরের মতোই রুদ্ধশ্বাসে, গলায় বারে বারে ঝাপটা খায় তার পাঘাটি।'

গল্প এখানেই শেষ করেন সৈকত কিন্তু আমাদের জন্য রেখে যান প্রকৃত এক লোকায়তিক কাহিনির মর্মন্তুদ বেদনা। যাতে কোনো শহুরে ভান নেই উৎকল্পনার।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সৈকত রক্ষিত যে-পরিমাণে গ্রামীণ লোকায়তের বিশ্বাসভাগী জনসাধারণের ঘনিষ্ট, কিন্নর রায়কে সে অনুপাতে অনেক শাহরিক মনে হতে পারে। তাঁর গল্পের কাহিনি গঠনে, বিষয় নির্বাচনে নানাধরনের ক্ষমতা ও প্রবণতা দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কোনো ভাবেই তাঁকে গ্রামীণ ভাবুকতার মানুষ বলা যাবে না, কিন্তু গ্রামকে জেনেছেন কিন্নর, তাঁর নিজের মতো করে। তাতে ফাঁক নেই। তাছাড়া আরেকটা প্রশ্ন ওঠে। গ্রামেই কি শুধু আছে লোকায়তিক পরিমণ্ডল? আধা শহরেও কি নেই? যে-সব মানুষ গ্রাম থেকে চলে আসে শহুরে বাস্তুতে তারা কি ভেতরে ভেতরে বয়ে আনে না সংস্কারজীবিত লোকযান? তবে কেন শহুরে পরিমণ্ডলে আজও বাজে সান্ধ্য শঙ্খ? গোবরছড়া আর

তুলসিঝারি, ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখানো আর বারব্রত আজও কেন বহতা? কিন্নরের গল্পে, নানা গল্পে, গ্রাম থেকে-চলে-আসা মানুষের লোকমানসতা ভারি উপভোগ্য।

'আবহমানের ছবি' কিন্তু অন্য এক কাহিনি; যার পটভূমি ফরিদপুর জেলার উপোসি গাঁ। সময় ১৯৩৪ সালের অক্ষয় তৃতীয়া। প্রতিবছর এ সময়েই গাঁয়ের মানুষ কাসুন্দি তৈরি করে। তার নানা উপচার ও অনুপুঙ্খ, অনেক বিধিনিষেধ ও বৈচিত্র্য। বিষয়টি বিশিষ্টভাবে গ্রামীণ ও আচরণময় এবং একান্তভাবে অন্তঃপুরের সামগ্রী। তাতে নানা বিধিনিষেধ ও পালন থাকে। কিন্নরের ডকুমেনটেশন তাঁর অসামান্য দৃক্‌শক্তিকে প্রমাণ করে, যা একজন আধুনিক লেখকের গুণ।

মদের চ্যাপ্টা সাইজের পরিত্যক্ত বোতলভর্তি যে-কাসুন্দি আজ শহর বাজার ছেয়ে ফেলেছে তার নকল স্বাদ গন্ধ ঝাঁঝ বহু মানুষের দীর্ঘশ্বাস জাগায়। বিশেষত সেই সব নাগরিকজন আজও স্মৃতিচারণ করেন 'কাসুন' বা কাসুন্দির জন্য যাঁদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রামে। ফেলে-আসা নানা স্মৃতির সঙ্গে তাঁরা মনে রেখেছেন গ্রামদেশে কাসুন্দি বানানোর ঘটনা, যা মা-দিদিমা কিংবা মা-ঠাকুমা-জ্যাঠাইমা-কাকিমার বাৎসরিক কৃত্য ছিল। তার কত আয়োজন, কত খুঁটিনাটি, কত মেয়েলি রিচ্যুয়ালে ভরা। অন্দরমহলে কাসুন্দি বানানোর সজীব অনুষ্ঠানের দর্শক ও উৎসাহী থাকত বাড়ির বালক বালিকা কিশোর কিশোরীরা। *'আবহমানের ছবি'* গল্পের কথক কিন্নর রায় যেন সেই বয়স-থমকে-থাকা কিশোরটি, যার আয়ত বিস্মিত চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে এমনতর একান্ত লোকায়ত লেহ্য ও পেয়।

ষাট বছর আগেকার ফরিদপুর গ্রামের পটভূমিকায় কাহিনি ও চরিত্রদের সাজিয়ে কিন্নর হারিয়ে-যাওয়া এক শুভ সংস্কারকে উস্‌কে দেন পাঠকদের কাছে। কাসুন্দি বানানো যাঁরা চাক্ষুষ করেছেন বা করেননি দু'তরফেরই লাভ এই গল্প পাঠে। ডকুমেনটেশনটুকু দেখা যাক—

> নতুন গামছায় কালো সর্ষে প্রায় দু-আড়াই সের। সঙ্গে সামান্য হলুদ, তেজপাতা, জিরে ধনে—সব মিলিয়ে বারো রকম মশলা

প্রায়। বোঁটাঅলা সবুজ কাঁচা আম, গিলা এল—সবই গামছার বুকে। জলে ডোবানো ওঠানো, হাতের পাতা দিয়ে ঘষে ঘষে ধোয়াধুয়ির সঙ্গে নানা বর্ণে রোদের মনোরম কারুকাজ।

লেখকের সতর্ক সজাগ চোখে শস্য, উৎসব ও নিসর্গ একসঙ্গে ধরা পড়েছে। অক্ষয় তৃতীয়া অর্থাৎ রৌদ্রসনাথ বৈশাখ এ উৎসবের অধিপতি। তাই—

মধ্য বৈশাখের রোদ-লাগা ভোর। পাছদুয়ার পুকুরের ঘাটে বাঁ-পা এবং জলে ডান পা-টি ডুবিয়ে, কোমর থেকে পিঠ মাথা গলা বুক ঝুঁকিয়ে এনে, লালচে নতুন গামছায় কালো সর্ষে ধুতে ধুতে উমা টের পেল অক্ষয় তৃতীয়ার পৃথিবী বড় তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উঠছে।

উল্টোদিকে তারই মুখোমুখি...দাঁড়িয়ে দেড়বছরের ছোট জা শৈল গামছার ছোট খুঁটি বাঁ হাতে ধরে, ডানহাতে জলের সর্ষে আর অন্যান্যদের রগড়াতে রগড়াতে প্রায় মন্ত্রের উচ্চারণে বিড় বিড় করে বলেছিল—চিনি চিনি, মধু মধু হইও। বারো বারো বচ্ছর থাইকো। হগ্‌গলের ভালো দেইখো।

এ তো কেবল কাসুন্দি বানানোর প্রকরণ নয়, এক অচ্ছেদ্য পারিবারিকতার বন্ধনছবি। যৌথ ও আবহমান। শুধু তো খাদ্যপ্রণয়ন নয়, সেইসঙ্গে সুদীর্ঘ শুভকামনার মাঙ্গলিক।

উমা ও শৈল এই দুই এয়োস্ত্রীর পাশে কিন্নর রাখেন দুই বিধবা। ননদ শিবি আর কর্ত্রী শাশুড়ি হৈমবতী। সংসারটি হৈমবতীর। তাঁর পুত্র সন্তান বিজয় অন্নদা ও অক্ষয়। তাদের তিন বউ—সৌদামিনী, উমা ও শৈল। গল্প যখন শুরু তখন সৌদামিনী ঘোর সুতিকায় আক্রান্ত, আড়াই মাস আগে তার এক অপুষ্ট 'আটাশে' মেয়ে জন্মেছে। আর আছে হৈমবতীর নাতি-নাতনীরা, কেবল শৈল এখনও নিঃসন্তান। আপাতত হৈমবতী-উমা-শৈল তৈরি করছেন কাসুন্দি কেমন করে?

তিন নারী গামছায় বাঁধা সর্ষে ধুয়ে কলসিতে পুকুর জল ভরে বাড়ির উঠোনে পৌঁছে যায়। সেখানে গোবর মাটি ল্যাপা

অনেকখানি জায়গায় ঐ ভিজে গামছাটি পেতে তারা সর্ষে এবং মশলাদের শুইয়ে দেয়। তীব্র রোদ জল টেনে নিতে থাকে। আর ঐ কলসির জল, যাকে আর জল বলা যাবে না, বলতে হবে মধু, ঢেলে দেয়া হয় পরিষ্কার উনোনের আঁচে বসানো মাজা বিশাল পিতলের হাঁড়িতে। তাপে বাষ্প হয় জল বা 'মধু'।

তীব্র তাপে সর্ষে শুকিয়ে ওঠে। আগুনের হল্‌কা হাঁড়ির ভেতর জলকে নির্দিষ্ট মাপের জায়গায় পৌঁছে দেয়। ঢেঁকি-ঘরে অনেকগুলি পায়ের পারা পড়ে। সর্ষে কোটা হয়ে যায়। তারপর সেই ফুটন্ত জলের ভেতর সর্ষে এবং নুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচন্ড ঝাঁঝে নাক জ্বলে, চোখও। খেজুর গাছের পাতা ফেলে দেয়া সরু কাঠটির সাহায্যে স্নান সেরে আসা, পরিষ্কার কাপড় মোড়া হৈমবতী কাসুন্দি নাড়েন, নাড়েন। এবং কখনও শিবি কখনও শৈল বা উমা।

কাসুন্দি ফুটতে থাকে, জ্বাল হতে থাকে, গল্পে এসে পড়ে কাসুন্দি নাড়তে নাড়তে, এ বাড়ির বিধবা মেয়ে শিবি। কিন্নর ক্রমে এসে যাবেন তাঁর গল্পে। তার আগে জানিয়ে দেবেন পরবর্তী আচার অনুষ্ঠানকে। যেমন পিতলের হাঁড়ি থেকে মাটির হাঁড়িতে কাসুন্দি ঢালা, তার মুখে পরিষ্কার কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া, শিকেয় তোলা নতুন দুর্বার গুছি দিয়ে কাসুন্দির সাধ হবে উলু ধ্বনিতে। পরে রথযাত্রা কেটে গেলে, নিস্তারিনী পুজোর দিন ঘট নামবে। ব্যবহার হবে। খাদ্যে আসবে আস্বাদ।

কিন্নর একথা উল্লেখ করতে ভোলেন না যে, 'যাদের বাড়ি কাসুন্দি হয় না, বিশেষ্ করে মুসলমানেরা কাল পরশু থেকেই বাড়িতে আসতে আরম্ভ করবে বাটি নিয়ে। ওদেরও কাসুন্দি দিতে হবে—এক হাতা এক হাতা, এমন প্রায় সারাবছরই। এ নিয়ম আবহমানের,' ছোট কিন্তু জরুরি এই উল্লেখটুকু কিন্নরের লেখক হিসাবে জাত চিনিয়ে দেয়। লোকায়তের এই আবহমানতা তাঁর গল্পে একটা আলাদা আলো ফেলে। গ্রাম-সমাজ-বন্ধনের একটা অচ্ছেদ্য আলেখ্য, অসাম্প্রদায়িক ও স্নিগ্ধ, তিনি তুলে আনেন গল্পের ছলে। কাসুন্দি মেলবন্ধন ঘটায় সচ্ছল আর

অসচ্ছলের মধ্যেও, তাই অত বিশদ আয়োজন, অত বড় পেতলের হাঁড়ির ব্যবহার। তার চেয়েও বড় অবশ্য বড় পরিবারের কর্ত্রী ঠাকরুন হৈমবতীর প্রসারিত মনের ঔদার্য। গ্রামদেশে এই ঔদার্যই ছিল আবহমান। কেবল তা ফরিদপুরের উপোসি গ্রাম নয়। এ গল্প তার মহত্ত্ব ও বিন্যাসে ছাড়িয়ে যায় ছোট এক বিশেষ গ্রামের বৃত্ত, ছড়িয়ে পড়ে আবহমানের লোকবৃত্তের স্বচ্ছ উজ্জ্বল প্রসন্নতায়। সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে পড়ে যায় না কি যে, ষাট বছরের আগের এই উপোসি গ্রাম আজও নিশ্চয়ই রয়ে গেছে এখানকার বাংলাদেশে কিন্তু তাতে নেই সেই প্রসন্নতার ঔদার্য, নেই লোকউৎসবের এমন গাঢ় বৈশাখী রৌদ্রচ্ছায়া? মূল স্রোতের মানুষগুলিই তো ছিন্নমূল হয়ে চলে এসেছেন। হৈমবতীর সংসারও ভেঙে চুরে ছত্রাখান। এ গল্পে কাসুন্দি কেবল একটা ধরতাই নয়, যেন এক মেদুর ছায়াময় স্মৃতি।

স্মৃতি, মায়াময় এবং শ্রান্তিহারী। হৈমবতীর বিধবা মেয়ে শিবিরও রয়েছে এক স্মৃতিভারাতুর কিন্তু স্বস্তিকর লোকায়ত অবস্থান। তার শ্বশুরবাড়ির ভদ্রাসন ও গ্রামের নির্ভুল স্মরণীয়তা শিবিকে চাঙ্গা রাখে তার বৈধব্যের মধ্যেও। গভীর শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও শিবি মনে মনে পৌঁছে যেতে পারে ধাউনকায়, তার শ্বশুরবাড়ির চৌহদ্দিতে। তার অম্বিকা মন্দির, অষ্টভূজা দুর্গা। কিছুদূরে বুড়োশিবের মন্দির। কিন্নরের বর্ণনা :

> বিশাল দীর্ঘ শিবলিঙ্গ। মাথায় কোনো ছাদ নেই। এর পেছনেও এক প্রচলিত মিথ। বুড়ো শিব নাকি মাথার ওপরে ছাদ মেনে নেননি। বহুদিন আগে একবার ঢেকে দেওয়ার পর স্বপ্নে দেখা দেন সেবায়েতকে। তারপর প্রচলিত ধারা অনুযায়ী দেবতার পদাঘাতেই নাকি মন্দিরের ছাউনি নিশ্চিহ্ন। এখন ছাদ বলতে আকাশ।...রাত নিশুত হলে খড়ম খটখটিয়ে বুড়ো শিব নাকি অভিসারে যান অম্বিকার মন্দিরে।

কাসুন্দির অনুষঙ্গে পিত্রালয়ের নির্বাসে থাকা শিবির শ্বশুরালয়ের স্মৃতিচারণ অনবদ্য। কিন্নর পরতে-পরতে খুলে দেন লোকায়ত বিশ্বাসের পৃথক জগৎ—গ্রাম্য জনপদ-মিথ-দেবদেবীর লোকায়ন। এমন এক স্বতোনির্মিত আচ্ছন্নতার মধ্যে গল্প এগোয়। ইত্যবসরে বাড়ির বড়বৌ

সৌদামিনীর সুতিকা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বিছানার পাশে শিশু-শরীর না পেয়ে প্রবল জ্বরবিকারের ঘোরে একিদ-ওদিক হাতড়ায় সৌদামিনী। বাড়ির উঠোনে বাইরের রোদ খাওয়া নতুন কাসুন্দির হাঁড়ির সামনে কোত্থেকে যেন উড়ে আসে অলুক্ষুণে দাঁড়কাক। তাকে তাড়াতে চায় বালকরা। কাক সরে না, উড়ে বসতে চায় হাঁড়ির ওপর, বিশ্রি ডাক ডকে। শিবির ছেলে অনাথ একটা ঢিল এনে ছোঁড়ে কাকের দিকে।

> কাক ওড়ে, হাঁড়ি ভাঙে। শহর থেকে আসা ডাক্তারকে বিদায় জানাতে উঠোনে আসা অনেকেই দেখতে পায় ভাঙা হাঁড়ির গা গড়িয়ে পড়া সোনালি কাসুন্দি শুকনো ধুলোটে মাটির বুকে একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে—কোন হারামজাদার কাম—বলেই হৈমবতীর ডুকরে ওঠা। কারণ তিনি তো তাঁর সংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে আছেন—কাসুন্দির হাঁড়ি ভাঙা মানেই এক গভীর অমঙ্গল, এমন কি মৃত্যুও।

গল্প এরপর তার অনিবার্য টানে কোথায় যায়, পাঠককে তা বলার দরকার নেই। শুধু এইকথা উল্লেখ করা যথেষ্ট যে বাংলা ছোট গল্পে লোকায়ত বিশ্বাসের জগৎ এমন উজ্জ্বলতায় খুব কমই উদ্‌ভাসিত।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর গল্পে মিথ আর লোকায়ত জগৎকে অনবরত টেনে আনতে পারেন খুব মেধাবী প্রয়োগে। স্বপ্নময় গ্রামীণ বিষয়ের সিদ্ধ লেখক নন, কিন্তু গ্রাম্য বিশ্বাসের মানুষজনকে বেশ জানেন চেনেন এটা বোঝা যায়। একটা সক্রিয় অনুধাবন থাকে তাঁর গল্পের উপস্থাপনে। তাছাড়া প্রতিবাদী একটা বক্তব্য, কিছুটা ব্যঙ্গ বা পরিহাসের ঝোঁকে তিনি বেশ নিপুণভাবেই করতে পারেন। তাঁর গল্পের অন্তর্গত লোকায়তিক মানুষ সর্বদা গ্রাম্য পরিবেষ্টনীর হয়তো নয়। যেমন ধরা যাক, '*দুলালচাঁদ*' গল্পের পটভূমি কল্যাণী উপনগরের কাছে ঘোষপাড়ায় সতী মা-র মেলা। এ-মেলা আজ আধা-শহুরে রূপ নিয়েছে, কিন্তু এতে অংশগ্রহণকারী বারোআনা মানুষ গ্রামীণ জনপদ থেকে আসেন। আসেন বছর বছর, রোগমানসিক করতে আর 'হত্যে' দিতে। দিনটি নির্দিষ্ট। ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

সতী মা-র থানে হিমসাগরের জলে স্নান ও ডালিমতলার মাটি মাখা নাকি সর্বরোগহর। ময়নামতী আর দয়াময় এসেছে মিথ-ভারাতুর সেই ঘোষপাড়ায়।

কী সেই মিথ? কোনো এক কালে আউলেচাঁদ নামে ফকির এসেছিলেন ঘোষপাড়ার চাষী রামশরণ পালের কাছে। রামশরণের মরণাপন্ন স্ত্রী সরস্বতীকে তিনি স্বমন্ত্রসিদ্ধ হিমসাগরের জলে ডালিমতলার মাটি মেখে গায়ে লাগিয়ে বাঁচিয়ে দেন। ব্যস, সেই থেকে স্থান মাহাত্ম্যের সূচনা এবং জনশ্রুতির জন্ম। সরস্বতী দেবী হয়ে যান সতীমা, তাঁর ছেলে হয়ে জন্মান জন্মসিদ্ধ দুলালচাঁদ। সেই থেকে স্থানমাহাত্ম্যে এবং অলৌকিকের লোকায়তে ঘোষপাড়া কানা-খোঁড়া-বোবা-কালা-পঙ্গুদের রোগহর হয়ে ওঠে বিশেষত সেইসব পল্লীবাসীদের কাছে যারা অশিক্ষিত ও অসহায়। সেই অন্ধবিশ্বাস ও কিংবদন্তীর অলৌকিক আবহমান।

স্বপ্নময়ের গল্পের শুরু এইভাবে :

> দয়াময়ের দু'হাতে অনেক মাদুলি, হাঁটুর চারপাশে খোস্‌পাঁচড়া। পাঁচড়া চুলকোলে মাদুলি বাজে ঝনঝন।
>
> মায়ের সঙ্গে এসেছে সতী মায়ের থানে।...মা সেই আমগাছটা খুঁজছে।

আমগাছ বলতে আটবছর আগে চিহ্ন করা, তিন কুড়ুলের ঢ্যারা মারা, একটা গাছ যা পূর্বপুরুষের বসানো। সেই গাছটা সনাক্ত করে মা চিল্লেন দিয়ে বলে, 'গাছটা পেয়েছিরে দয়া।' মা মানে ময়নামতী। 'ধপ করে কোলের বাচ্চাকে ভুঁয়ে ফেলে গড় হয় ময়নামতী। পরিপূর্ণ গড় হলে পেটে লাগে, কারণ পেটে বড় হচ্ছে আরেকটা।'

কলমের দক্ষ টানে স্বপ্নময় এক লহমায় অতিপ্রজ অসহায় নারীটিকে আমাদের সামনে এনে দেন লোকায়ত কুসংস্কারে যার জীবন বাঁধা। ময়নামতী লাল পাড়ের দড়িতে ঢিল বেঁধে মাদুলি ঝমঝম দয়াময়কে দেয়। দয়াময় সেটা বাঁধতে মগডালে ওঠে। দেখে, 'দুলালচাঁদের মন্দিরের লাল নিশান, সতীমায়ের ডালিম গাছ পাঁপরওলা, জিলিপিওলা।' যতক্ষণ এ সব দেখে ও ঢিল বাঁধে ততক্ষণ ময়নামতী গাছতলায় চোখ বুঁজে জোড় হাতে

বিড় বিড় করে বলে, 'হে সাঁই হে দুলালচাঁদ হে ছিরি গৌরাঙ্গ—দয়ার বাপটারে কোথায় নুইকে রেখিচ? তেনারে ফিরিয়ে এনে দাও।'

গল্পটা এবারে তার ধরতাইয়ে এল। সন্তানভারে অবনতা নারী তার নিরুদ্দেশ-হয়ে-যাওয়া স্বামীর জন্য মানসিক করতে এসেছে সতীমায়ের থানে। মুহূর্তে ধর্মের দালাল আসে একজন। খেলারাম গুরুর পদচিহ্ন আর বাঁধানো ছবি বার করে। ময়নামতী আর দয়াকে বলে তাতে প্রণাম করতে। দুলালচাঁদের বর্তমান প্রজন্মের গুরুরা বসে আছেন সেখানে সেই দেবমহান্তদের বর্ণনা লেখক দেন—

> লম্বা দাওয়া। বাবুদের বারান্দার সারবন্দী ফুলের টবের মতো গুরুরা বসে আছেন। মহাশয় একজন গুরুর কাছে এসে থামলেন, তাই দয়া-র মা-ও থামল। আধো চোখ খোলা, মুখে আবীর, স্মিতহাস্য, গলায় কাশী গ্যাঁদার মালা, সামনে থালায় টাকা পয়সা, রেকাবীতে আবীর।...
>
> গুরু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'ছেলেকে মন্তর লেয়াবি?' ময়নামতী বলল, 'ছেল্যা এখনও বুঝের হয়নি বাবা, ছিমড়ে বড্ড ফড়ফড়ে।' গুরুর দুই হাত অসমান উচ্চতার দুই মাথার উপর নিবন্ধ। 'স্থির মতি হ, ভক্তিমান হ, ভক্তিবতী হ'। রেকাবীতে কয়েকটি ঠং ঠং ঠং।
>
> ময়নামতী পায়ের আবীর নেয় পুনরায়। আর বলে, 'আমার ওঁনারে ফিরি আসবার আশীব্বাদ দেন কর্তা।'

ময়নামতীকে বিয়ের পর তার বড়জা বলেছিল 'খড়মঠেঙী। খড়মঠেঙীরা বড়ো ভাতারখাগী হয়।' আপাতত তার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট। সবাই তাকে জিগ্যেস করে, 'কী লো সোয়ামী এল? কী করে সোয়ামী রাখবি, তুই যে খড়মপেয়ে।'

স্বামী তাকে বিশ্বাস করে না। তার অতিপ্রজ যৌবনকে সন্দেহ করে। সন্দেহ অমূলক নয়। একদিন এ নিয়ে ভোরবেলায় ঝগড়াঝাঁটি করে দয়ার বাপ, 'এই সংসারের সোগা মারি' বলে চলে গেছে। আর ফেরেনি। তারই জন্যে তুকতাক, গণক ঠাকুরের কাছে যাওয়া, ঘোষপাড়ায় আসা।

গণকঠাকুর বলেছেন তার স্বামী হয়েছে সন্ন্যাসী। আরও নানা রটনা কানে আসে। উপস্থিত সতীমায়ের মেলায় কর্তাবাবা বলেছেন, 'সতীমায়ের পাঁচালি শুনে হিমসাগরে ডুব দিয়ে আসে। দয়া তার ছোটভাই আর মুড়ির পুঁটলি সাপটে থাকে। ময়নামতী পিছলপথে জলকাদার মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে—টানটান হাত, সামনে মেলা। স্বপ্নময়ের বর্ণনায়,

> ময়নামতীর শরীর সতীমায়ের থানের দিকে এগিয়ে আসে। ময়নামতীর ঘাম ও লোল কাদায় মেশে, শ্রবণ ও দৃষ্টি কাদার মতো বেতাল হয়...হাজার মানুষের কলরব খৈ ফোটার শব্দের মতো চিড়বিড় করে।...তারপর জনস্রোত ওকে নিয়ে নেয়। ওর শরীর এলিয়ে পড়ে।...ওর শরীর মাড়িয়ে দেয় ভিড়ের পাগুলো। জয় সতীমা শব্দ। ময়নামতী বলার চেষ্টা করে—'পেটেতে পা দিওনিগো, বাচ্চা আছে, বাচ্চা।' জনতার ছুঁড়ে দেওয়া সিঁদুরের দুএকটা মোড়ক ময়নামতীর গায়ে এসে পড়ে, জয়,—জয় সতীমা হে...কতকগুলো পায়ের চাপ ময়নামতীর হাতে বুকে, পেটে, ময়নামতীর শাড়ির কাদার আস্তরণ ক্রমশ লাল হতে থাকে। কাদার সঙ্গে মাখামাখি হয় রক্তের।

এমন মর্মন্তুদ মৃত্যু, জনবিশ্বাসের চাপে, অন্ধ সংস্কারপন্থী মানুষের পদতলে ময়নামতীর মৃতদেহ হঠাৎ সতী-মহিমা পেয়ে যায়। লোকায়ত কুসংস্কার কতখানি ভয়ংকর ও অপূর্বকল্পিত এ-গল্পে তার হদিশ মেলে। গল্প এগোয়। মা-র মৃত-দেহের সামনে বিমূঢ় হতবাক দয়াময় ভাইকে কোলে নিয়ে বসে থাকে। সতী মা নাকি ভর করেছেন ময়নামতীর সত্তায়, তাই তার 'খাংলাচুল সিঁদুরে সিঁদুর।' চারিদিক থেকে পয়সা পড়ছে ঠং ঠং। ময়নামতীর অলক্ষী অপয়া খড়মঠেঙী পা আলতায় রাঙা হয়ে যায়। সবাই তাকে প্রণাম করে ভক্তিভরে।

কিছু পরেই লাশ চলে যায় মর্গে, সবাই হুলুধ্বনি দেয়। দয়াময় থ। হঠাৎ একজন দয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'সতীমায়ের ছেলে—তুই—তুই সাক্ষাৎ দুলালচাঁদ।' পয়সা পড়তে থাকে। গল্পের পরিণামে দয়াময় অবশ্য হয়ে যায় মেলার এক মিষ্টির দোকানের বয়।

দোকান মালিক তাকে দুলালচাঁদ বলেই ডাকে। দুবছর পরে আবার সেই সতী মায়ের মেলায় আসে দুলালচাঁদ মহামায়া মিষ্টান্ন ভান্ডারের কর্মচারী হয়ে। 'সেবার দুলালচাঁদ দোকান থেকে এক চপ্পরে কেটে গিয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে একবার দেখে এসেছিল সতীমায়ের ঠেক, যেখানে ওর মা টস্‌কে গিয়েছিল।' এই বলে গল্প শেষ করেন স্বপ্নময়।

গল্পটি ভাল না মন্দ, বিশ্বাস্য না অবিশ্বাস্য, আমরা সে বিচারে না গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা আমাদের সামনে প্রবাহিত লোকজীবনে মেলামচ্ছবে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের হুল্লোড় একটা বাস্তব সত্য। সাক্ষরতা অভিযান ও বিজ্ঞান চেতনা সমিতি ও সবের কোনরকম নিরোধ বা প্রচার কমাতে পারেনি। মেলায় পদপিষ্ট হয়ে মরার বিবরণ আমরা প্রায়ই কাগজে পড়ি। সতীর উত্থান এ-দেশে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের তাই যা চমৎকৃত করে তাহল স্বপ্নময়ের কল্পনার অনায়াস দক্ষতা এবং সেই সঙ্গে লোকায়তিক বিশ্বাসের অন্ধ একমুখী জীবন প্রবাহের সত্য ও সজীব বিবরণ আঁকার প্রয়াস। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সতীমা-র পাঁচালির ঢঙে পয়ার ও ত্রিপদী রচনার কৌশলে বর্ণনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন লেখক। '*দুলালচাঁদ*' এক মর্মভেদী কাহিনি।

সব মানুষের একটা বিশ্বাসের জগৎ থাকে, সেটাই তার প্রত্যয়ভূমি। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের কাছে বিশ্বাস ও প্রত্যয় যে-সবলতা আনে, অশিক্ষিত মানুযের বিশ্বাস অনেক সময় তার উল্‌টো বাঁকে চলে। কিন্নর ও স্বপ্নময়ের গল্পে অন্ধবিশ্বাস টেনে আনে দুর্বল অলৌকিক মিথকে। অভিজিৎ সেনের গল্পে লোকায়ত বিশ্বাসের একটা অন্য গড়ন দেখি। অভিজিতের গল্পের পটভূমি ও উপভাষা উত্তরবঙ্গের, সেটা গল্পে একটা রহস্যময়তা ও সজীবতা জাগায়। তাঁর '*ঈশানী মেঘ*' গল্প শুরু হয় এইভাবে :

> নোনা, ধসা, পাথর আর ঝড়, এই হল চার শত্রু। ও যদি সামলাতে পার, তবে বরোজ তোমার ছনের ঘরে টিন ওঠাবে, তারপর টিন নামিয়ে তুমি ইটের দালান দেবে। আর যদি ঠিক ঠিক এসব

সামলাতে না পার, তবে ছনের ঘরে তুমি পরের বছর খড়ও গুঁজতে পারবে না, মহাজনের ঘরে দেনাদার হবে, পরে তোমার ভিটেমাটি উচ্ছেদ হবে, সবশেষে নির্বংশ হবে। ও হল পানচাষের দুই দিক, এর মাঝামাঝি কিছু নেই।

বেশ জমজমাট গল্প, যার বিষয় পান চাষ আর পান বরোজের নানা রিচুয়াল ও কুসংস্কার। বলাবাহুল্য এ সব মিথ যারা পান খায় তাদের কাছে চুঁইয়েও আসে না, কিন্তু গ্রামদেশে বাস করে যারা, তারা পান বরোজের ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ম কানুন জানে না এমন হয় না। পান চাষ নাকি সব বংশে হয় না এ সংস্কার লোকায়তিক সমাজ ব্যবস্থার রক্তগত। নোনা, ধসা, পাথর আর ঝড়—এই চার শত্রুকে মোকাবিলা করার করণ আছে, তা গুহ্য এবং পরম্পরাবাহিত, গোপন।

ধৈর্য মাহাতো এ গল্পের প্রধান মানুষ, যার আছে এমন দুর্লভ পরম্পরাবাহিত শিক্ষা। সবাই তার কথা শোনে এবং মানে। 'ধৈর্য এসব খুব বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার গর্ব নিয়ে বলে।' এক্ষেত্রে বিশ্বাসের পাশে অভিজ্ঞতা কথাটি লক্ষণীয়। লোকায়তে এটা একটা গণনীয় শক্তি। ফসলের সম্পর্কে পূর্বাভাস, খরা বন্যার আগাম জানানদারি, বৃষ্টি হবে কিনা তার পূর্বানুমান সব গ্রামেই অভিজ্ঞ মানুষ আগে ভাগে বলতে পারেন। বহুদর্শিতা ও মাটি-ঘেঁষা জীবন তাঁদের চালায়।

ধৈর্য মাহাতো কেবল যে পানবরোজ সম্পর্কে জ্ঞানী তা নয়, সে কর্মীও। ঝড় খেদা, পাথর খেদা, বরোজ বন্ধ, বাণব্রতের যাবতীয় গুপ্তবিদ্যা যেমন সে জানে, তেমনই জানে হাতে কলমে বরোজে সজীব ও সতেজ পান ফলাতে। চৈতন্য দাসমহান্ত ও তার ছেলে নীলকণ্ঠের বরোজ কতদিনের পরিশ্রমেও কৌশলে ফলন্ত রেখেছে ধৈর্য। সেবারকার বিধ্বংসী ঝড়ে সকলের বরোজ উল্‌টে গেলেও কই নীলকণ্ঠের বরোজ তো খাড়া ছিল! এ সবের মানে কী?

'ঈশানী মেঘ' আসলে এক অন্ধ আনুগত্যের গল্প। পান বরোজের প্রতি ধৈর্য-র প্রবল আনুগত্য, গুরু চৈতন্য দাস কানে বীজমন্ত্র দিয়েছেন বলে তাঁর এবং তাঁর সন্তান নীলকণ্ঠের প্রতি আনুগত্য আজীবনের। এ নিয়ে

তার নিজের স্ত্রী ও পুত্র নবীন ক্ষুব্ধ। প্রশ্ন ওঠে, 'এ কেমন কারিগরি? পেরথমে চৈতন্য দাস, তা বাদে তার বেটা নীলকণ্ঠ দাসের সেবা করি জেবন গেল। আপনা বলতে এক পোয়া পান দেখাবার পারিছে কোনদিন?'

এ বিষয়ে ধৈর্যের মতামত সিধেসাধা, 'বাপুরে, ওলা কাম পারমো না। বাপ মরিছে বেহোঁস বয়সেৎ, মোক্ যি হাতে-পায়েৎ দাঁড় করালো, সি হয়লো মোর কত্তা। তে মরার সোমায় কত্তা মোক ঠাউরের পায়েৎ সমপ্পন করি গিইলো না? বেইমানি করি কেম্‌কা?' এই একটা মস্ত স্বারোপিত মূল্যবোধ আর আনুগত্য ধৈর্য মাহাতোর জীবনভিত্তি। এর জন্যেই সে নিজের জমিজিরেত পায়নি, নিজের বরোজ করেনি। একেই একধরনের এককাট্টা গোঁড়ামি বলা যায় যা লোকায়ত সমাজেই গড়ে উঠতে পারে কেবল। এর ফলে সে যে বঞ্চিত ও শোষিত হচ্ছে ধৈর্য তা বোঝে না, উপরন্তু আনন্দ পায়, পান ফলানোর কৃতিত্বের আনন্দ, সৃষ্টি ও রক্ষণের আনন্দ। এরজন্য তার কোন কৃতিত্ব আছে তাও সে মনে করে না। বিশ্বাস করে, 'ঠাউরের কেরপা আছে মোর মাথাৎ।' তার মুখে দুঃখী অথচ কৃতার্থ মানুষের মতো এক রকমের হাসি সব সময়ে খেলে যায়। অসাধারণ তার নিবিষ্টতা। মাস গেলে ত্রিশটা টাকা আর দেড়মন ধান তার সংসারে সাশ্রয় ও স্বস্তি আনে না, তবু—

> নীলকণ্ঠের ছ'খানা বরোজ সে সামলায়। এই ছ'খানা বরোজের প্রত্যেকটি পিলি তার নখদর্পণে। কোথায় জল দিতে, কোথায় খোল দিতে হবে, কাকে দিতে হবে চিনি।

সে পান বরোজে একা একা পানের সঙ্গে কথা বলে। সে জানে যে বরোজ অতি পবিত্র স্থান। ধোয়া কাপড় পরে বরোজে ঢুকতে হয়। দেহে অসুখ বা অশুচি মনে বরোজে ঢোকা নিষেধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পান বরোজে প্রবেশাধিকারই থাকে না। ঠাকুর বলত, 'ধৈজ্জ, পান পাতা আর তুলসীপাতা সমজ্ঞান করবা।' ধৈর্য এসব উক্তি প্রত্যাদেশের মতো মান্য করে। আর যখন আষাঢ়ের সূচনা হয়, ঈশানকোণে মেঘ জমে, তখন, সে—

বরোজের উত্তর-পূর্ব কোণে গিয়ে দাঁড়ায়, গাছগুলো তখন ঝড়ের আগের প্রথম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তাকে দেখায় কঠোর সংকল্পব্রতী কোনো সন্ন্যাসীর মতো। বাতাসের বেগ বাড়ছে। পাছা-কাছা খুলে ধৈর্য সেখান থেকে বাঁ-হাতি ঘুরতে থাকে। বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ায় সে। নীলকণ্ঠের বরোজ বন্ধ করে ধৈর্য, যাতে কোনো অশুভ শক্তি, চোর-ডাকাত, ঝড়, শিলাবৃষ্টি অর্থাৎ 'হালকা চলকা-বায়-বাসাত' কোনো ক্ষতি করতে না পারে বরোজের। চলতে চলতে সে অনুচ্চস্বরে মন্ত্র আওড়ায় এবং শেষ হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা প্রবল হাঁক দেয়।

এ-ও এক বিশ্বাসের নিভৃত জগৎ, পবিত্র ও লোকায়ত। যাতে কেবল ধৈর্য নয়, তার মালিক নীলকণ্ঠও আস্থাশীল। গল্প পড়তে পড়তে বোঝা যায় নীলকণ্ঠের বিশ্বাস যে, ধৈর্য থরে থরে তার পান বরোজে পান ফলাবে, তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচাবে অথচ কখনও কোনোদিন বাড়তি সুযোগ চাইবে না। ধৈর্যও জানত, নীলকণ্ঠের পানবরোজ কটায় তার অখণ্ড অধিকার ও নেতৃত্ব। সেই বিশ্বাসে ঘা লাগল যেদিন নীলকণ্ঠের 'বংশে প্রথম একটা পাশ দেওয়া' ছেলে গোবিন্দ বরোজে মেয়ে মানুষ নিয়ে ঢোকে। ধৈর্য তাকে হাতেনাতে ধরে, মেয়েটা পাটখড়ির বেড়া ভেঙে পালায়, কিন্তু গোবিন্দ খায় ধৈর্যের হাতে চড়। ধৈর্যের মাথার মধ্যে সবকিছু ভাঙচুর হয়। চড় খেয়ে গোবিন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্যকে মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। শাসায় এই বলে, 'খপরদার, মোর কামে নাক গলাবা না। জানে খতম করে দিমো।' ধৈর্যর আরেকটা বিশ্বাসের জগতে চিড় খায়। ঠাকুর চৈতন্য দাসের বংশে তবে কি ধ্বংস আসন্ন? বরোজ অশুদ্ধিতেই কি তার সূচনা? নাকি এ একেবারে ধৈর্যেরই দোষ? ঠাকুর বংশের সন্তানের গায়ে হাত তোলা। সে অনুতপ্ত হয়। তবু নীলকণ্ঠের বউ তাকে কড়কে দেয়। নীলকণ্ঠ তাকে বলে অন্য কোথাও উঠে যেতে। ধৈর্য বজ্রাহত হয়ে ভাবে—

এই বরোজগুলো তাকে ছেড়ে যেতে হবে? প্রত্যেকটি লতার সঙ্গে তার যে নিজের নাড়ীর বন্ধন। বর্ষা আসছে, এখন যে সবগুলো

লতাকে একহাতে করে নামিয়ে দিতে হবে। নতুন পাতা আসবে না এখন? পরিচর্যা যদি ঠিকমতো না হয়, এই পানে কেউ মুখ দিতে পারবে? পুড়বে না মুখ? এত বড় বর্ষাটা সামনে, নোনা আটকাবে কে? মাঠাল উঁই কাঠি বেয়ে লতা বেয়ে উঠবে, কে নজর রাখবে এসব?

অভিজিতের অনবদ্য ডকুমেনটেশন এবং সেই সঙ্গে চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি। আনুগত্য ও পান বরোজের প্রতি ভালবাসার অচ্ছেদ্য নেশা। কর্তার পান বরোজ, যিনি দিয়েছেন গুরুমন্ত্র।

ধৈর্যকে উচ্ছেদ করায় সবচেয়ে খুশি হয় তার বউ এবং ছেলে নবীন, কেন না ধৈর্য মাহাতোর মতো গুণী কর্মীকে ভিটেমাটি দিয়ে বরোজে বসানোর লোক গ্রামে অনেক আর তার ফলে এবার পরিবারটা কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারবে। ধৈর্য এতবড় পরিবর্তন মেনে নিতে ছেলে বউয়ের কাছে দু'দিন সময় চেয়ে নেয়। আর সেই দু'দিনের মধ্যে ঘটনার মুখ ঘুরে যায়। গ্রামে কদিন ধরে যে সেটেলমেন্ট ক্যাম্প বসেছিল সেখান থেকে জানা যায় নীলকণ্ঠের এক একর পরিমাণ একটা দাগের খোঁজ পাওয়া যায়, রায়তের নাম ধৈর্য মাহাতো। কানুনগো ধৈর্যকে ডেকে পাঠান। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি অসুস্থ ধৈর্যের কাছে ছুটে যায় দিশেহারা নীলকণ্ঠ। বলে,

ই জমিটা—ই যে ভিটা, বুঝলে? যেথায় তুমার ঘর—আর ই বরোজ, বুঝলে?

ধৈর্য মাথা নাড়ে, অর্থাৎ, না, সে বোবোনি।

ই ভিটাটা তুমার নামেৎ আছে।

মোর নামেৎ? কেমন?

ওভাবেই করা আছে। এখন এনা শোনেক্, কাল অপিছারের কাছেৎ যায়া বলবা হবে, হঁ, ইটা মোর জমি।

ধৈর্য আরেকবার অধৈর্য হয়ে পড়ে। জমি তার নয়, আবার তারই? উচ্ছেদের হুকুম পেয়েছে সদ্য তবু মিথ্যে কথা বলতে হবে অফিসারকে? নীলকণ্ঠ তাকে বোঝায়, 'মিছা লয়, ফের মিছাও।' ধৈর্য নীলকণ্ঠের কাছেও সময় চায় ভাববার। নীলকণ্ঠ চলে যেতেই ছেলে নবীন বলে, 'ই ভিটা

ছাড়া যায় না, ই ভিটা মোরা ছাড়মো না! ...হঁ, তুমু কবা, ই জমি তুমার, আর মুই কমো, ছার ই জমির দখল হামরাদের করাই দেন, ব্যাস।'

শ্রান্ত দিশেহারা সত্য মিথ্যার দোলাচলে দুলে ধৈর্য ঘুমিয়ে পড়ে এবং শেষরাতে মেঘ গর্জনে তার ঘুম ভেঙে যায়। যে ধড়ফড় করে উঠে বসে। বৈশাখের মেঘ গর্জন সে মর্মে মর্মে বোঝে। ভাবে, সে কি যাবে বরোজের ঈশান কোণে? গুরু চৈতন্য দাসের বরোজ। এইখানে তার জীবনের বাস্তবতা, বউ-ছেলের ভবিষ্যৎ আর গুরুবংশের প্রতি আনুগত্যের মূল্যবোধে লড়াই বাধে। দ্বন্দ্বের মাঝখানে উঠে আসে সেই চিরকালের লোকায়তিক সংস্কারে-গড়া মানুষটা। নিজের কথা নয়, নীলকণ্ঠের শত্রুতাও নয়—তাকে টানতে থাকে বরোজের অসহায়তা। বরোজ বাঁচাতে হবে তাকে। সে না ধৈর্য মাহাতো? কাজেই সে এক লাফে উঠোনে নামে, অন্ধের মতো ছোটে বরোজের দিকে। অভিজিতের বর্ণনা

> তীব্র গতির ঝড়, তার সঙ্গে প্রবল গর্জন ও বিদ্যুৎ। মেঘ গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধৈর্য অশ্লীল গালি বর্ষণ করতে থাকে প্রকৃতির উদ্দেশে। অশ্লীল এবং উত্তপ্ত সব কটু বাক্য। ক্রমশ আরো অশ্রাব্য কথা তার মুখ থেকে বার হয়, যে-রকম একটা কথাও স্বাভাবিক অবস্থায় সারাজীবন বলেনি। তারপর সে মন্ত্র পড়ে। সাতবার সে মন্ত্র পড়ে। সাতবারে তারা, ভবানী, 'শুতরা' কালী, বিষহরি, মহাদেব ইত্যাদি সাত দেবদেবীর নামে পাদপূরণ করে ধ্বনি দেয়। প্রতিবারের শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা প্রবল হাঁক ছাড়ে। কিন্তু ঝড়ের গতি বাড়ে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি।

নিসর্গ ও মন্ত্রের লড়াই, ঝড় আর মানুষের লড়াই, বৈশাখী তাণ্ডব আর ধৈর্যের অমানুষী বিশ্বাস, কে জয়ী হবে? আজকে ধৈর্যের আনুগত্য প্রমাণের দিন, শক্তি প্রমাণের ক্ষণ, লোকায়তের অহংকার প্রতিষ্ঠার লগ্ন। ধৈর্য তার কাপড় খুলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাসে আবার মন্ত্র পড়ে, দ্বিগুণ গালি দেয়, হাঁক পাড়ে, শেষপর্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গি করে নাচতে থাকে।

হঠাৎ যেন ভোর হয়। না, বিদ্যুতের আলোয় সে দেখে তার নিজের

হাতে তৈরি বরোজগুলো ধ্বস্ত চেহারা। 'সেই তার শেষ অনুভূতি, প্রচণ্ড হতাশা ও দুঃখ। সে আকাশের দিকে আঙুল তুলে কী যেন বলতে চায়।' পরদিন ভোরে নবীন আর মা ধৈর্যকে আবিষ্কার করে বরোজের উত্তর-পূর্ব কোণে স্তূপ করা পাটখড়ির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত। দাঁড়িয়ে থাকা তার দেহ আকাশের দিকে চিরকালের মতো ভয়ংকর শাসনের ভঙ্গিতে সংকেত করছে।

অনুতপ্ত নীলকণ্ঠ সব দেখে শুনে নবীনকে বলে, 'রপঘাত মিত্যু, বরোজে ছোঁওয়া লাগা ঠিক লয়, বাপ। ...আহা, কী মানুষ! ক্ষোণিকের ভেরান্তি, ঠাউরের নাতির গায়েৎ হাত, আর দেখ, কেমন আপসোস।'

গল্প অবশ্য শেষ হয় অন্য এক মাত্রায়, সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা শুধু দেখি উত্তরবঙ্গের এক গ্রাম্য জনসমাজ তাদের বিশ্বাসের দ্বিচারিতায় কেমন অসহায়। ধৈর্য মাহাতো যেন লোকায়ত আর বাস্তবের মাঝখানে তর্জনী তুলছে।

পত্রলেখা প্রকাশিত

সুধীর চক্রবর্তীর অন্যান্য বই

গান হতে গানে

একান্ত আপন

ঘরানা বাহিরানা

নির্জন সজনে

মাটি পৃথিবীর টানে

কবিতার খোঁজে

অনেকান্ত রবীন্দ্রনাথ

লোকসমাজ লোকচিত্র

নানা রবীন্দ্রনাথের মালা (সম্পাদিত)